“পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে লেডি কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি জজ, লেডি ব্যারিস্টার সবই হইব। পঞ্চাশ বছর পর লেডি Viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে ‘রাণী’ করিয়া ফেলিব।”

- বেগম রোকেয়া

নারীর কথা-১১

নারীর কথা
NARIR KATHA

THE HUNGER PROJECT

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

নারীর কথা-১১

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৬ উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদনায়
ড. বদিউল আলম মজুমদার

প্রকাশকাল
০৮ মার্চ ২০১৬

THE HUNGER PROJECT
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

নারীর কথা - ১১
আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৬ উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

উপ-সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

বিশেষ কৃতজ্ঞতায়
শাহীনা আক্তার
তনুজা কামাল
শামীমা আক্তার মুক্তা

প্রথম প্রকাশ
৮ মার্চ ২০১৬
কপিরাইট: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে:
আর এস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৩১/১, পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০
০১৭১৮২১৬২৬১

প্রকাশক:
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
৩/৭ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২-৭৯৭৫, ৯১৩-০৪৭৯, ফ্যাক্স : ৮১১-৬৮১২
ফেসবুক: www.facebook.com/THPBangladesh

ISBN: 978-984-34-0634-7

Narir Katha - 11
(Collected writings on the occasion og International Women's Day-2016)

First Published : 8 March, 2016

Published by :
The Hunger Project
3/7 Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207
Tel: 811-2622, 812-7975 Fax: 811-6812
Web: www.thp.org & www.thpbd.org

সম্পাদকীয়

'২০৩০ এর অঙ্গীকার, নারী-পুরুষের সমতার'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবং '২০৩০ এজেন্ডা' বা এসডিজি'র ওপর আলোকপাত করে আমরা এ বছর পালন করছি আন্তর্জাতিক নারী দিবস। উল্লেখ্য, 'এসডিজি' হলো বিশ্বমানবতার সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ গৃহীত একটি কর্মপরিকল্পনা, যা বিশ্বব্যাপী শান্তি, সমৃদ্ধি ও কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে এবং নিশ্চিত করবে নারীর ক্ষমতায়ন।

ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১'-সহ জেন্ডারবান্ধব আইন প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।

আমরা মনে করি, স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন আশাব্যাঞ্জক পর্যায়ে পৌঁছেছে। উৎপাদনমুখী সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। নারীদের এ এগিয়ে যাওয়া প্রমাণিত করে যে, বাংলাদেশের নারীরা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে, একই সাথে হতে পারে উন্নয়নের অংশীদার। আর নারীদের এ অগ্রগমনে অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

একদল সচেতন নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট উজ্জীবক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিতকরণ ও তাদের নেতৃত্বকে বিকশিত করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করে। উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এক দল নারীকে সংগঠিত, ক্ষমতায়িত ও জাগ্রত করার ব্রত নিয়ে গড়ে ওঠে 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক', যার মূল লক্ষ্য নারীরা যেন নিজেরাই সর্বক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের মূল রূপকার হয়ে উঠতে পারে। 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের বলিষ্ঠ করে তোলার সুযোগ প্রদান করা হয়। ইতিমধ্যে তৃণমূলে একদল রূপান্তরকারী নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে, যারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের সহায়ক।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিকশিত এই নারীদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে বেশকিছু উদ্যোগ। তারা স্থানীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেরা আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসতে সহায়তা করছেন। দান-অনুদান আর পরনির্ভরতার সংস্কৃতির বাইরে তাদের এ সকল দৃষ্টান্ত আজ অনেকের মধ্যেই আশাবাদ সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি চলছে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীর সার্বিক উন্নয়ন। নারীর প্রতি সহিংসতা ও চলমান বৈষম্য দূরীকরণে নারীনেত্রীগণ সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে চলেছেন। এ গ্রন্থে প্রকাশিত গল্পগুলো তাদেরই প্রচেষ্টা ও দৃষ্টান্তের প্রামাণ্য দলিল।

'নারীর কথা' একটি ধারাবাহিক সংকলন। ২০০৬ সালে এর প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হয়। সময়ের ধারাবাহিকতায় সাফল্যের সোপান বেয়ে এবার তৃণমূলের ২৩ নারীনেত্রীর সফলতার গল্প নিয়ে প্রকাশিত হলো 'নারীর কথা-১১'।

আমরা মনে করি, সফলতার এ গল্পগুলো পড়ে সমাজের অন্যসব নারীরা অনুপ্রেরণা পাবেন এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন। নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হবেন এবং সমাজের উন্নয়নে আরও বেশি পরিমাণে তারা ভূমিকা রাখতে পারবেন।

আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে নারীদের এসকল সাফল্যগাঁথা সংগ্রহ করেছেন।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি'র 'বাংলা বানান–অভিধান' (তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫) অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রন্থে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ও মুদ্রণপ্রমাদ থাকলে পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ, বিশেষ করে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ গল্পগুলো যদি অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে, তবে সেটিই হবে এ গ্রন্থের সাফল্য।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

সূচিপত্র

- নিভৃত জীবন সংগ্রামী সাহিদা ইসলাম — ০৯
  সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন
- নিপীড়িত নারীদের ভরসা সেলিনা — ১৩
  খায়রুল বাশার
- আলোকিত নারী ফারজানা আক্তার মিলি — ১৭
  কাজী ফাতেমা বর্ণালী
- গুলশান আরা বিউটি: সমাজ সচেতন এক নারী — ২১
  মোহাম্মদ মাঈনুল ইসলাম
- রিপু প্রভা নাথ: সময় এখন এগিয়ে যাওয়ার — ২৬
  মোহাম্মদ মাঈনুল ইসলাম
- অদম্য নারীনেত্রী শওকত জাহানের গল্প — ২৯
  মোহাম্মদ মাঈনুল ইসলাম
- বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেন জুলেখা আক্তার — ৩১
  জিল্লুর রহমান
- জনপ্রতিনিধি হওয়ার স্বপ্ন দেখেন মরিয়ম বেগম — ৩৫
  জিল্লুর রহমান
- অদম্য এক স্বেচ্ছাব্রতী হেলেনা বেগম রহিমা — ৩৯
  মো. মামুন হোসেন
- গংগাচড়ার সফল সংগঠক নাছিমা — ৪৩
  চন্দ্র শেখর
- জীবনকে সার্থক করে তুলতে চান ফটো আপা — ৪৭
  রাজেশ দে
- আদর্শ গ্রাম তৈরির কারিগর নারীনেত্রী সুরাইয়া — ৫৩
  পলাশ মন্ডল

সূচিপত্র

- আম্বিয়া খাতুন: একজন সফল নারী উদ্যোক্তা — ৫৯
  মো. আসাদুল ইসলাম আসাদ
- মেহেরপুরের প্রতিবাদী নারী কণ্ঠ রহিলা বেগম — ৬৪
  মো. আজিবার রহমান
- সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে রোজিনার এগিয়ে চলা — ৬৭
  খোরশেদ আলম
- নারী নির্যাতন বন্ধে সোচ্চার বাসন্তী রাণী — ৭১
  রিতা পুরোকায়স্থ
- শ্রীমঙ্গলের জয়তুন: এক সংগ্রামী নারী — ৭৫
  এস.এ হামিদ
- নারী-পুরুষ সম-মর্যাদার সমাজ গড়তে চান সুপ্রিয়া চক্রবর্তী — ৮০
  এস.এ হামিদ
- আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীক পাটিচরার রেহেনা বেগম — ৮৪
  মো. রবিউল ইসলাম
- সালমা এখন পথের দিশারী — ৮৯
  হারুনুর রশিদ
- অসহায় নারীদের অনুপ্রেরণার উৎস টুম্পা রাণী বিথীকা — ৯২
  মো. গিয়াস উদ্দীন
- লীলা রাণী দাস: হার না মানা এক নারী — ৯৮
  মনিরুজ্জামান
- জীবন সংগ্রামে জয়ী রীতা রায় চৌধুরী — ১০২
  সাধন দাশ

নিভৃত জীবন সংগ্রামী সাহিদা ইসলাম

সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন

গ্রামের নাম হেমনগর। টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলা সদর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ গ্রামটি। জমিদার হেমচন্দ্রের নামানুসারে এই গ্রামের নামকরণ করা হয় হেমনগর। এই গ্রামে বাস করতো একটি সুশিক্ষিত পরিবার। পরিবারের কর্তা মাওলানা মো. সেকন্দার আলী মাস্টার। তার স্ত্রীর নাম আমিনা বেগম। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সকাল, চারদিকে পৌষের প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়া, এরই মাঝে আমিনা বেগম-এর কোলজুড়ে জন্ম নেয় সপ্তম সন্তান। বাবা আদর করে নাম রাখলেন সাহিদা ইসলাম। সাহিদারা পাঁচ ভাই, তিন বোন।

ছবি: ২০১৫ সালে শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে চেয়ারম্যান পদক গ্রহণ করছেন সাহিদা

শিক্ষিত পরিবার হওয়ায় পারিবারিকভাবেই শিক্ষার প্রতি সবাই ছিলেন আগ্রহী। সাহিদাও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। সাহিদা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও সমান পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি বরাবরই চ্যাম্পিয়ন হতেন। প্রধান শিক্ষক বাবার প্রাচুর্যের মধ্যেই চলছিল সাহিদাদের সকল ভাই-বোনের লেখাপড়া। এরই মাঝে তাদের পরিবারে নেমে আসে বিপর্যয়। সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বাবা সেকান্দর আলী। সাহিদা তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারে নেমে আসে আর্থিক বিপর্যয়। বড় ভাই দায়িত্ব নেন পরিবারের দেখভাল করার। তার মাঝেই কষ্ট করে সাহিদার লেখাপড়া, ধীরে ধীরে।

১৯৮১ সালে হেমনগর শশীমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন সাহিদা। ভর্তি হন ভূঞাপুর ইবরাহীম খান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে, বিএ-তে। মামা নূরুল আমিন নান্নু-এর (অলোয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান) বাড়িতে থেকে ১৯৮৬ সালে বিএ পাশ করেন তিনি। এরপর সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে মাস্টার্স প্রিলিমারিতে ভর্তি হন। ১৯৮৯ সালে সাহিদা নবগঠিত সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েসন (SDS) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করেন।

১৯৯০ সালে পারিবারিক সিদ্ধান্তে পাশের ঝাওয়াইল ইউনিয়নের ভাদাই গ্রামের বেকার যুবক সাইফুল ইসলামের সাথে বিয়ে হয় সাহিদার। ১৯৯১ সালে স্বামী একটি চাকরি পান। এরপর নিজের চাকরি ছেড়ে স্বামীর সাথে রাজশাহী চলে যান সাহিদা। সেখানে থাকাবস্থায় আর্থিকভাবে সফল হলেও সুখী সাইফুল-সাহিদার দম্পতির জীবনে নেমে আসে মানসিক বিপর্যয়। তাদের প্রথম সন্তানগুলো (যমজ) মারা যায়। ১৯৯৩ সালে শাহিদার কোলজুড়ে আসে এক ফুটফুটে কন্যাসন্তান। কিন্তু মাত্র দেড় বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শিশুকন্যাটিও মারা যায়। স্বামী সাইফুল ইসলাম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং চাকরি ছেড়ে দেন। ঐ সময় সাহিদা চাকরি নেন একটি ওষুধ কোম্পানিতে। তার চাকরির অর্থ দিয়ে চলতে থাকে সংসার। শিশুকন্যাটি মারা যাওয়ার কিছুদিন পর জন্ম নেয় এক পুত্র সন্তান।

সময় বয়ে যেতে থাকে। এরইমধ্যে সাহিদা রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ থেকে দশ মাস মেয়াদি এলএমএএফসি কোর্স সমাপ্ত করেন। ১৯৯৭ সালে সাহিদার কোলজুড়ে জন্ম নেয় দুটি যমজ সন্তান। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। আবারো সবাইকে কাঁদিয়ে বিদায় নেয় ছেলেটি। বর্তমানে এক ছেলে তমাল ও এক মেয়ে যুথিকে নিয়ে সাহিদার সংসার। ১৯৯৮ সালে সাহিদা নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাহিদা ও তার ক্যান্সার আক্রান্ত মেয়ের চিকিৎসা করাতে গিয়ে পরিবারে নেমে আসে আর্থিক সংকট। এ বছর তারা রাজশাহী ছেড়ে ফিরে আসেন টাঙ্গাইলে। সাহিদা হেমনগরে নেয়া একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করতে শুরু করেন।

টাঙ্গাইলে ফিরে এসে তিনি শশীমুখী কিন্ডার গার্টেন-এর অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন। স্বামীর চাকরি না থাকায় আর্থিক অভাব-অনটনের মধ্য দিয়েই চলছিল সাহিদার সংসার। ২০০৭ সালে হেমনগর ইউনিয়নের নারীনেত্রী আনজু আনোয়ারা ময়নার

আহ্বানে সাহিদা শাখারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১,৩৩৫তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জানান, এই উজ্জীবক প্রশিক্ষণটিই তাকে পরিবর্তন করে দেয়। এখান থেকেই শুরু হয় সাহিদার জীবনের দ্বিতীয় সংগ্রাম। তিনি আরও জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মূল শ্লোগান 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'– তাকে উজ্জীবিত করে। তাকে ঘুরে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা যোগায়। এছাড়াও নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার ও জেন্ডার বৈষম্যের স্বরূপ ইত্যাদি আলোচনাগুলো তার জ্ঞানকে বাড়িয়ে দেয়।

ছবি: স্বেচ্ছাব্রতী পুনর্মিলনী-২০১৫ উপলক্ষে নারীদের অংশগ্রহণে ক্রিকেট খেলছেন সাহিদা

উজ্জীবক প্রশিক্ষণের পর তিনি ২০০৮ সালে টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (৭১তম ব্যাচ) এবং ২০১৪ সালে ৭৬তম গণগবেষণা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এরপর সাহিদা শিক্ষকতার পাশাপাশি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করেন। তিনি গত কয়েক বছরে ৫৯টি উঠান বৈঠকের আয়োজনের মাধ্যমে প্রায় ৮৫০ জন নারী-পুরুষকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তুলেছেন। বিশেষ করে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের কাছে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা পৌঁছে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। সাহিদা আন্তর্জাতিক নারী দিবস, জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপনে এবং স্থানীয়ভাবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে সকল প্রচারাভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

সাহিদা বয়স্কদের স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার লক্ষ্যে একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করেন। ইতোমধ্যে তার প্রচেষ্টায় ৩০ জন নারী-পুরুষ অক্ষরজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। সাহিদার উদ্যোগে ২৫ জন নারী-পুরুষকে বসত বাড়িতে সবজি চাষ, ৫০ জন নারীকে দর্জি বিজ্ঞান এবং ২৫ জনকে মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১৫ জন নারী কাপড় সেলাই করে আয় করছেন।

২০১৪ সালে সাহিদার নেতৃতে গড়ে ওঠে 'প্রত্যাশা গণগবেষণা সমিতি', যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৫ জন, সাপ্তাহিক চাঁদা ৫ টাকা। বর্তমানে সমিতির মোট সঞ্চয় ১১ হাজার টাকা। সাহিদা এই সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার গণগবেষণা চর্চার উদ্দেশ্যে সমিতির সদস্যরা সভায় মিলিত হন। তারা নিজেদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন এবং সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা নেন। এছাড়া তারা সমিতির টাকা দিয়ে বিভিন্ন পণ্য কিনে নিজেদের মাঝেই সেগুলো বিক্রি করেন। এর মাধ্যমে সমিতির মুনাফা হয় ১ হাজার ২০০ টাকা। উপরোক্ত সমিতি ছাড়াও সাহিদা 'হেমনগর কেন্দ্রীয় সততা গণগবেষণা সমিতি'র নির্বাহী সদস্য এবং ইউনিয়ন পরিষদের পারিবারিক বিরোধ নিরসন ও নারী ও শিশু কল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য।

সাহিদার স্বামী বর্তমানে আবারো চাকরি করছেন। চাকরির পাশাপাশি পরিবারের আয় বাড়ানোর জন্য নিজ গৃহে একটি কোচিং সেন্টার স্থাপন করেছেন। কোচিং সেন্টার থেকে তাঁর প্রতিমাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা আয় হয়। সাহিদা বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করেন এবং স্বামীর সহযোগিতায় বাড়িতে একটি হাঁস ও একটি মুরগির খামার দিয়েছেন।

সাহিদা তার ছেলেকে মালয়েশিয়ায় (লিংকন বিশ্ববিদ্যালয়) পাঠিয়েছেন উচ্চশিক্ষা লেখাপড়ার জন্য। আর একমাত্র মেয়ে স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলবি-তে ভর্তির অপেক্ষায় আছে।

সাহিদা তার অনবদ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ সেচ্ছাসেবী হিসেবে চেয়ারম্যান পদক লাভ করেন। সাহিদা ইসলাম জানান, নিজের মনের জোর এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণায় তার আজ এই পরিবর্তন। পরিবারে অভাব নেই, তাই সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করতেও তার কোনো বাধা নেই।

নিপীড়িত নারীদের ভরসা সেলিনা

খায়রুল বাশার

পুরো নাম মাহ্‌মুদা চৌধুরী, বাবা-মা আদর করে ডাকতেন শিলই। বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে এসে নাম পরিবর্তন হয়ে যায় সেলিনা আক্তার। কারণ ফুফু শাশুড়ির নাম এক হয়ে যাওয়ায় শ্বশুর হাফিজুর রহমান ভূঁঞা আদর করে ডাকতেন সেলিনা। সেই থেকে সব নাম ছাপিয়ে সেলিনা আক্তার নামে এলাকায় পরিচিতি লাভ করেন তিনি।

সেলিনা আক্তারের জন্ম ১৯৭২ সালের ১২ আগস্ট কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার ধলা গ্রামের চৌধুরী বাড়িতে। বাবা মোমতাজ উদ্দিন চৌধুরী, আর মা রাবেয়া চৌধুরীর চার ছেলে ও দু মেয়ের মধ্যে সেলিনার অবস্থান পঞ্চম। লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও রক্ষণশীল সমাজের নিয়মের কাছে হার মানতে হয় সেলিনাকে। এসএসসি পর্যন্ত লেখাপড়ার পর বাল্যবিবাহ নামক অভিশাপের কবলে পড়ে মাত্র ষোল বছর বয়সে সেলিনাকে চলে যেতে হয় পাশের উপজেলা করিমগঞ্জের কাদিরজঙ্গল ইউনিয়নের পিটুয়া গ্রামের মজিবর রহমান বাদলের বউ হয়ে।

বিয়ের পর অতি অল্প দিনেই সেলিনা উপলব্ধি করতে পারেন যে, যে গ্রামে তার বিয়ে হয়েছে সেখানে মেয়েদের জন্ম হওয়াটাই যেন একটা অভিশাপ। সমাজ এখনো এখানে নারীদের সাথে প্রায় ইতর প্রাণীর মতোই ব্যবহার করে। এমতাবস্থায় সেলিনা অঙ্গীকার করেন, যে কোনো মূল্যে হোক তিনি নিপীড়িত নারীদের দিন বদলের জন্য কাজ করে যাবেন। সে মোতাবেক তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সমাজের সমর্থন আদায় করা তার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকেই এটাকে অহেতুক সময় নষ্ট, এমনকি বাড়াবাড়ি বলে বারবার থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। অনেকের কাছ থেকে নানা অপবাদ পর্যন্ত হজম করতে হয় তাকে। কখনো কখনো নিজেকে হতোদ্যম মনে হতে থাকে।

সেলিনার ভাষায় ঠিক সে সময় সেলিনা ইউপি সদস্য ও উজ্জীবক ফজলু মেম্বার ও ইয়ুথ লিডার শফিকুল ইসলামের মাধ্যমে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাজের সাথে প্রথম যুক্ত হন। করিমগঞ্জের ৩৬ জন নারীর সাথে ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে ময়মনসিংহের আসপাডা ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১২০তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের সেই থেকে আজ অবধি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন সেলিনা। উজ্জীবক

ছবি: জাতীয় স্যানিটেশন মাস উপলক্ষে আয়োজিত প্রচারাভিযানে সেলিনা আক্তার

প্রশিক্ষণ আয়োজন, বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারাভিযান, বসত বাড়িতে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ এবং নাগরিকত্ব কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নেয়ার কাজটি করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। এছাড়া নিয়মিতভাবে তিনি স্যানিটেশন, জন্মনিবন্ধন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, পুষ্টি ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে উঠান বৈঠক করে এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছেন। উল্লেখ্য, শিশুর অপুষ্টি রোধে এক হাজার দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে কাদিরজঙ্গল ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি গ্রামে, এমনকি পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নেও সেলিনা গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের নিয়ে উঠান বৈঠক করে আসছেন।

এলাকার সাধারণ মানুষ নারী-পুরুষ-আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাদের প্রয়োজনে সেলিনা আপার কাছে ছুটে আসে। আর বিভিন্ন সমস্যায় নিপতিত মানুষগুলোকে নিয়ে লড়তে লড়তে সেলিনার গোটা জীবনটাই হয়ে যায় অনেক টুকরো টুকরো কেইস স্টোরির সমষ্টি। যেমন,

কেইস-১: পিঠুয়ার পূর্বপাড়ার হাদিছের স্ত্রী স্বপ্না সন্তান সম্ভবা ছিলেন। রাত ৩.০০টায় শ্বশুর দূর্লভ মিয়া ছেলের বউয়ের খারাপ অবস্থা দেখে সহযোগিতার জন্য নারীনেত্রী সেলিনার কাছে ছুটে আসেন। এত রাত্রে দূর্লভ মিয়াকে দেখে সেলিনা স্বামীকে নিয়ে স্বপ্নার বাড়িতে যান এবং দেখেন যে, রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। প্রসবের জন্য রোগীকে পেটে গামছা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। সেলিনা সেখানে থাকা ধাত্রীকে দেখেই চিনতে পারেন, যার কোনো প্রশিক্ষণ নেই, ধাত্রী হাতের আংটি ও চুড়ি খোলেনি, হাত পরিষ্কার করেনি, নখ কাটা ছিল না– এই অবস্থায় সে কাজ করছিল। এর বীপরিতে সেলিনা ইউনিয়ন পরিষদে ধাত্রী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল। সেলিনা ধাত্রীকে জিঙ্গাসা করেন যে, রোগীর পেট বাঁধা হয়েছে কেন? উত্তরে বলেন, সন্তান প্রসব হচ্ছিল না তাই এমনটা করেছেন। সেলিনা তাকে বলেন যে, প্রসবব্যাথা উঠার নির্ধারিত সময়ের প্রথম ধাপের মধ্যে প্রসব না হলে মা এবং সন্তান ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। সেলিনা রোগীর অবস্থা দেখেই প্রথমে পেটের গামছার ভান খোলেন এবং প্রশিক্ষণ অনুযায়ী কাজ শুরু করেন এবং কিছু সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব হয়। স্বপ্না ও ছেলে উভয়েই বর্তমানে ভাল আছে। সেলিনা যদি ঠিক সময়ে স্বপ্নার ব্যবস্থা না নিতেন হয়তোবা মা ও ছেলে কাউকেই বাঁচানো যেত না।

কেইস-২: স্বপ্নার মত পিঠুয়ার পাঁচবাড়ির খোকনের স্ত্রী রাব্বানার প্রসব বেদনা ওঠে। খোকনের মা এসে সেলিনাকে তার বাড়িতে নিয়ে যান। রাব্বানা সেখানে থাকা ধাত্রীর দিকে লক্ষ করেন এবং দেখেন যে, পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ধাত্রীর হাতের নখ কাটা থাকলেও হাতের চুড়ি ও হাতা ভালভাবে পরিষ্কার করা নেই। সেই শেষ রাতে রাব্বানার প্রসব ব্যাথা উঠলেও সন্তান প্রসব হচ্ছিল না। রাব্বানাকে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে কাপড় দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে সন্তান প্রসব হয়। এই অবস্থা দেখে সেলিনা তাড়াতাড়ি তার এক পরিচিত ডাক্তারকে ফোন দেন এবং ডাক্তারের পরামর্শে রোগীকে মাত্র একটি ট্যাবলেট খাওয়ানোর ১০ মিনিটের মধ্যেই সুস্থভাবে সন্তান প্রসব হয়।

কেইস-৩: যৌতুক ও বাল্যবিবাহে বন্ধেও সক্রিয় রয়েছেন সেলিনা। সম্প্রতি তার প্রচেষ্টায় স্থানীয় এক তরুণী হাসি-এর বিয়েতে যৌতুক দেয়া বন্ধ করেন তিনি। হাসির বাবার কাছে ৬০ হাজার টাকা যৌতুক দাবি করে বরপক্ষ। এর মধ্যে মাত্র ছয় হাজার টাকা দেয়ার সামর্থ্য ছিল না হাসির বাবা করিম মিয়ার। সাবেক ইউপি সদস্য ফজলু মেম্বারকে সাথে নিয়ে সেলিনা বরপক্ষের সাথে কথা বলেন এবং তাদের বোঝান যে, যৌতুক নেয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাদের হস্তক্ষেপে যৌতুক দেয়া ও মেয়েকে বিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকেন হাসির বাবা। বর্তমানে হাসি কর্মসংস্থানের জন্য ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছেন এবং গার্মেন্টসে কাজ করছেন।

কেইস-৪: পিঠুয়ার রহিম মিয়া তার ১৬ বছর বয়সী মেয়ে জেসমিনের বিয়ে ঠিক করেন। সেলিনা তখন জেসমিনের বাড়িতে গিয়ে তার বাবাকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু রহিম মিয়া মেয়েকে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অটল থাকেন। পরে বাধ্য হয়ে সেলিনা ফজলু ও রহমান মেম্বারকে নিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন।

এরকম অসংখ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন সেলিনা আক্তার। কেউ বিপদে পড়লে সেলিনা সবসময় আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য। এছাড়া সেলিনা শিশুদের জন্মনিবন্ধন করানো, অসহায় দরিদ্র মানুষদের ডাক্তারের কাছে নেয়া, অসহায় নারীদের ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভিজিএফ ও ভিজিডি কার্ডের ব্যবস্থা করে দেন।

সেলিনার সহযোগিতা নিয়ে স্থানীয় অনেক নারীই আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। আর সেলিনা তার স্বামীর কৃষিকাজের পাশাপাশি বাড়িতে ছাগল পালন, সবজি চাষ, মুরগি পালন, কলা ও লেবু চাষ করেন, যা থেকে প্রতিমাসে আয় হয় চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা।

সেলিনাকে ঘিরে এলাকার মানুষের মাঝে এখন একধরনের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। জনপ্রতিনিধি না হওয়া সত্ত্বেও তিনি এলাকার মানুষের জন্য সদা নিবেদিত রয়েছেন। সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সেলিনা ভবিষ্যতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান। তার সব কাজের সহায়ক ও সমর্থনকারী হিসেবে কাজ করেন স্বামী মজিবর রহমান বাদল। তিনি সবসময় ভাল কাজের জন্য সেলিনাকে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। সেলিনা বর্তমানে দু সন্তানের (এক ছেলে ও মেয়ে) জননী। বড় ছেলে নিটুল টেকনিক্যাল কলেজে গ্লাস ও সিরামিক বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ছে এবং মেয়ে অন্যন্যা এসএসসি পরীক্ষার্থী।

সেলিনা আক্তার মানুষের জন্য কাজ করাকে নিজের কাজ মনে করেন। তিনি মনে করেন, নিজে ভাল থাকলে চলবে না, আশপাশের মানুষগুলোও যাতে ভাল থাকে সে লক্ষ্যে চেষ্টা করতে হবে। আর এই শিক্ষাই তিনি পেয়েছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে।

আলোকিত নারী ফারজানা আক্তার মিলি

কাজী ফাতেমা বর্ণালী

ছোটবেলায় নিজেদের বাড়ির উঠানে প্রায়ই নারীদের অংশগ্রহণে সভা হতো। কতকিছু নিয়ে যে সেখানে আলোচনা হতো তার ঠিক নেই। কখনো শিক্ষা, কখনো নারী নির্যাতন, কখনো আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ–এইসব দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠা মিলির। মিলির মা ছিলেন ব্র্যাক স্কুল কমিটির সভাপতি, স্বাভাবিকভাবেই তাই তাদের বাড়িতে এসব সভা অনুষ্ঠিত হতো। ছোটবেলা থেকে মিলি দেখে এসেছেন তাদের বাড়িতে সভা বসতে। এভাবে সমিতি পরিচালনা ও সংঘবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বাল্যকালেই অভিজ্ঞতা হয় তার। সেই থেকে সমিতির সভা এবং সমিতির কাজগুলোকে নিজের মতো করে শিখে নেন তিনি। মায়ের কাছ থেকেই মিলির নেতৃত্ব দেয়ার হাতেখড়ি। ছোট্ট সেই মিলি এখন নারীনেত্রী এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। এলাকার উন্নয়নমূলক সব কাজেই এখন তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ।

মিলির পুরো নাম ফারজানা আক্তার মিলি। জন্ম ১৯৮৫ সালে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দীঘি ইউনিয়নের বানিয়াজুরিতে। তার লেখাপড়া শুরু হয় গিলন্দ রাকিব আহম্মেদ জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ে।

হঠাৎ একদিন মিলির বিয়ে হয়ে যায়। সেটা ছিলো ২০০০ সালের ঘটনা। মানিকগঞ্জ সদরে চামটা গ্রামে স্বামীর সাথে বসবাসের সূত্রে মিলির কাজেরও ক্ষেত্র হয়ে যায় চামটা গ্রাম। বিয়ের পরপরই সংসারে আর্থিক সহযোগিতা করার ফলে উদ্দেশ্যে মিলি ব্র্যাকের বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৩ সালে মিলির সংসারে আসে ফুটফুটে এক কন্যাসন্তান। বর্তমানে মিলি তিন সন্তানের জননী। স্বামী-সন্তানকে সময় দেয়ার পাশাপাশি মিলি সে সময় চাকরিতে ছিলেন একনিষ্ঠ। তার কাজের প্রথম স্বীকৃতি আসে ২০০৫ সালে। মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করার পর এ বছর তার গ্রাম ইউনিয়নে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

২০০৭ সালে মিলি আদর্শ গ্রামের গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে তার ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে। এরপর ২০১০ সালে পল্লী সমাজের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন মিলি। পল্লী সমাজের সাথে যুক্ত হয়ে পিছিয়ে পড়া জনগণকে সাথে নিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ে কাজ শুরু হয় তার। এভাবে ধীরে ধীরে মানুষের খুব কাছের হয়ে উঠেন মিলি। মানুষের এই ভালোবাসা মিলিকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে।

ইউপি সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর মিলির পরিচয় ঘটে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সাথে। এমডিজি অর্জনের লক্ষ্যে দীঘি ইউনিয়ন পরিষদ ২০১২ সালে ইউনিয়নে একদল নারীনেত্রী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিষদের চেয়ারম্যান আক্তারুজ্জামান রাজা মিলিকে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নিতে অনুরোধ করেন। তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মিলি ১০৬তম ব্যাচে উপরোক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে পরিচালিত এই আবাসিক প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে মিলি সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান, জেন্ডার বৈষম্য, পুরুষতন্ত্র, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধঃস্তন অবস্থার কারণ এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পান। মিলি অর্জন করেন নেতৃত্বের গুণাবলী।

এই প্রশিক্ষণটি ছিলো মিলির জীবনে একটি অনন্য অর্জন। মিলির ভাষায়, প্রশিক্ষণটি ছিলো আয়নার মতো, এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নিজেকে চিনতে পেরেছেন। তিনদিনের এই প্রশিক্ষণ শেষে মিলি নিজেকে নারীনেত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং এলাকার নারীদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ শুরু করার অঙ্গীকার করেন।

ঘটনা: মিলির বাবা তার মাকে ছেড়ে দেন কন্যাশিশু (মিলি) জন্ম দেয়ার কারণে। সেই ছোট্ট মিলিকে নিয়ে মা তার নানার বাড়ি চলে যান। সেখানেই মিলি বড় হন। সেই ঘটনা মিলির মনে ভীষণভাবে দাগ কাটে, ভুলতে পারেনি বাবার আচরণের কথা। মার বঞ্চনা তাকে সদা যন্ত্রণা দিত। মিলি জানান, আল্লাহ তাকে তিন কন্যা সন্তান দিয়েছেন। এতে তিনি এবং তার স্বামী খুবই খুশি। তিনি বলেন, 'আমরা দুজন মিলে আদর-যত্ন দিয়ে সন্তানদের মানুষের মত করে মানুষ করে গড়ে তুলবো। আমরা সমাজকে দেখাতে চাই যে, বিকশিত হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ পেলে কন্যাশিশুরা যোগ্য নাগরিক হয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে গিয়ে মিলি নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। প্রথমেই শুরু করেন উঠান বৈঠক। প্রতিমাসে এলাকার নারীদের নিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ, শিশুদের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধ, যৌতুক প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন ও অ্যাসিড নিক্ষেপ বন্ধ, শিশু, গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা সেবা ইত্যাদি বিষয়ে উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। ইতোমধ্যে তিনি নিজের এলাকায় ও এলাকার বাইরে ইস্যুভিত্তিক প্রায় একশ'টি প্রচারাভিযান, প্রায় ৫০টি কর্মশালা এবং এলাকায় প্রায় একশ' সালিশী বিচারে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা করেছেন। এই সকল কাজের মধ্য দিয়ে পরিচিতি আরও বাড়তে থাকে মিলির। এ পর্যন্ত ২০০ জন নারীকে বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন মিলি।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নিশ্চিত করার জন্য মিলি রাজনীতিতে আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেন। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভোটের মধ্য দিয়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর উপজেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি।

২০১৫ সালে মিলি নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করেন। এবছরই তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গণগবেষণা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে তার যাওয়ার রাস্তাটি অনেক সহজ করে দেয়। গণগবেষক হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করার পর মিলি এলাকার দরিদ্র মানুষদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ২০১৫ সালের ২৩ মার্চ ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটির যাত্রা শুরু হয়। সমিতির সাপ্তাহিক চাঁদা ২০ টাকা করে নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় ১২ হাজার ৯২০ টাকা। সমিতিটির একটি যৌথ ব্যাংক একাউন্ট আছে। মিলি এ সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই সমিতি তার সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। ঋণ দেয়ার আগে সমিতির সদস্যদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সেলাই, ব্লক-বাটিক-সহ অন্যান্য আয়মুখী কাজে নারীদের যুক্ত করাই প্রশিক্ষণগুলোর মূল উদ্দেশ্য।

এসকল কাজ মিলির সামাজিক অবস্থানকে বাড়িয়ে দিয়েছে। মিলিকে এখন শুধুই একজন নারী হিসেবে না দেখে সবাই একজন সমাজকর্মী হিসেবে দেখেন। শুধু সমাজেই না, পরিবারেও মিলির অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আগে তার কথার গ্রহণযোগ্যতা ছিল কম, কিন্তু বর্তমানে তার কথা ও পরামর্শ পরিবারের সবাই গ্রহণ করে। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৫ সালে ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয় কর্তৃক উপজেলার সেরা নারী (নেতৃত্ব বিকাশ) হিসেবে পুরস্কৃত হন।

মিলির নিজের মধ্যে একটি স্বপ্ন তৈরি হয়েছে। স্বপ্নটি হলো, এলাকার প্রতিটি নারী যেন স্বাবলম্বী হয়। তারা যেন তাদের সিদ্ধান্তগুলো নিজেরাই নিতে পারে। তিনি এমন একটি সমাজ চান, যেখানে নারী-পুরুষের সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

গুলশান আরা বিউটি: সমাজ সচেতন এক নারী

মোহাম্মদ মাঈনুল ইসলাম

পর্যটন নগরী কক্সবাজারের পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম গোলদীঘির পাড়। এই গ্রামে হাসপাতাল রোডের দক্ষিণ পাশে জামান ভিলায় বসবাস করেন এক সংগ্রামী নারী গুলশান আর বেগম। ডাক নাম বিউটি। পরিচিতরা সবাই তাকে বিউটি আপা নামে ডাকে। দিনমজুর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের পরিচিত এক মুখ।

আমার সাথে পরিচয় বিগত এক বছর থেকে। বিউটি আপার সাথে আমার প্রথম দেখা হয় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক এক ফলোআপ সভায়। তখন ওনার সম্পর্কে ততটা জানা ছিল না। মানুষ ঠিকই বলে– কারো সাথে গভীর আলাপ-আলোচনা ছাড়া কখনো কারো সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। জানা যায় না তার মধ্যে কতটুকু কর্মক্ষমতা আছে। আজ আমি লিখছি সে নারীর কথা...

গুলশান আরা বেগম বিউটির জন্ম ১৯৭৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর কক্সবাজারের পাহাড়তলী সড়ক এলাকায়। বাবা মৃত ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলী, আর মা হাসিনা বানু। পাঁচ বোন আর দু ভাইয়ের মধ্যে গুলশান আরা চতুর্থতম।

লেখাপড়ার হাতেখড়ি বাবার হাত ধরে–১৯৮৪ সালে টেকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলে বিউটি ছিলেন দুরন্ত চপলা এক মেয়ে। স্কুল জীবনের প্রায় প্রতিটি বিষয়েই তিনি ছিলেন প্রথম।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বিউটি ভর্তি হন কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। তখন থেকে তার মধ্যে জাগ্রত হয় পরিবারের বোঝা হয়ে নয়, বরং নিজ উদ্যোগেই লেখাপড়া করবেন। বিউটি অষ্টম শ্রেণি থেকেই লেখাপড়ার পাশাপাশি পাড়ার শিক্ষার্থীদের টিউশনি করাতেন। টিউশনি থেকে তার যে আয় হতো তা দিয়ে নিজের লেখাপড়ার খরচ যোগাড় করতেন। তারপরও পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে বিউটির লেখাপড়ায় বাধা আসে। বাবা-মা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। কিন্তু বিউটির স্বপ্ন ছিল উচ্চশিক্ষা অর্জন করা। সে স্বপ্নপূরণে গুড়েবালি, বাবা-মা অল্প বয়সেই, এসএসসি পরীক্ষার পর তাকে বিয়ে দিয়ে দেন একই শহরের ছেলে রফিকুর রহমান-এর সাথে। লেখাপড়ার প্রতি অদম্য আগ্রহের কারণে স্বামীর ঘরে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার মাঝেও বিউটি স্ব-উদ্যোগে ২০০২ সালে কক্সবাজার কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। এখানেই থেমে যাননি তিনি। বিএ অনার্স পাশ করার পর মাস্টার্স, এরপর এলএলবি-প্রিলি সফলতার সাথে পাশ করেন।

ছবি: অবহেলিত নারীদের বিউটি পার্লার পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন গুলশান আরা বেগম বিউটি

এইচএসসি পাশের পর থেকে তিনি ইউএনডিপি-তে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে, হোটেল সী গালে কম্পিউটার ও টেলিফোন অপারেটর পদে, ইয়ং ওয়ান কোরিয়ান কোং নামক প্রতিষ্ঠানে টেলিফোন অপারেটর হিসেবে, ডাচ্ বাংলা ব্যাংক, আইএফআইসি ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকে সেলস্ অফিসার পদে কাজ করেছেন। লেখাপড়ার ফাঁকে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিউটি সেলাই, কম্পিউটার, বিউটিফিকেশন ও হোটেল ম্যানেজম্যান্ট-সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

২০০৮ সালে স্বামী রফিকুর রহমানের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বিউটি বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। গুলশান আরা বেগম বিউটি জানান, প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তার চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তিনি বুঝতে পারেন, শুধু গুটিকয়েক মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন করলে হবে না, তাকে পুরো সমাজের উন্নয়নের জন্যই চেষ্টা করতে হবে, যদিও একজন নারী হিসেবে তা তার জন্য একটু কঠিন ব্যাপার।

কর্মজীবনে বিউটি স্বামী ও দীর্ঘদিনের বান্ধবীদের অনুপ্রেরণায় স্থানীয় লাইট হাউস কিন্ডার গার্টেনে শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপর ২০১১ সালে তিনি জাতীয় মহিলা সংস্থায় বিউটিফিকেশন ট্রেড প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। এ সময় তিনি

সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের জন্য নানা পরিকল্পনা আঁকতে থাকেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিউটি এলাকার অবহেলিত নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যান। বর্তমানে তিনি নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের আইনি সহায়তা দেয়া এবং স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিতদের স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন। তার এসব কাজে তাকে সহায়তা করেন তার স্বামী এবং বিকশিত নারীনেত্রীবৃন্দ। গ্রামের অস্বচ্ছল পরিবারের ২৫০ জন মেয়েকে – যৌতুক দিতে না পারার কারণে যাদের বিয়ে হচ্ছিল না – বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ শিখিয়েছেন বিউটি। বিউটি জানান, পরবর্তীতে দক্ষতার কারণে যৌতুক ছাড়াই এসব নারীদের বিয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এসব কাজের কারণে গুলশান আরা বেগম অন্য নারীদের জন্য হয়ে উঠেছেন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিশের-ও অধিক শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ, ৪৫ জন শিশুকে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করা এবং অনেক শিশুকন্যার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং ১১১ জন গর্ভবতী নারীর নিরাপদ মাতৃত্বকালীন সেবা নিশ্চিত করেছেন গুলশান আরা বেগম। পাশাপাশি যৌতুক প্রতিরোধেও কাজ করছেন। এছাড়া স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ, নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তুলছেন। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে উঠান বৈঠক করে নারীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করছেন। এসব কাজের কারণে গুলশান আরা বেগম অন্য নারীদের জন্য হয়ে উঠেছেন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

বিউটি তার মহৎ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে এসএমই ফাউন্ডেশন হতে বিউটিফিকেশনে অনন্য অবদান রাখার জন্য পুরস্কার লাভ করেন। ৯ ডিসেম্বর ২০১৫ বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের মধ্যে তিনি শিক্ষা ও চাকরি ক্যাটাগরিতে মনোনীত হন এবং পুরস্কার লাভ করেন।

বিউটি জানান, তিনি তার পরিবার এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ আজকের সাফল্য অর্জনে তার পরিবার ও হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ তাকে যুগিয়েছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে বিউটি আপা জানান, তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে আরও বেশি সময় দিতে চান। কক্সবাজার সদর উপজেলাকে নিরক্ষর ও বাল্যবিবাহমুক্ত হিসেবে গড়তে ও দেখতে চান। সর্বোপরি নারী নেতৃত্ব গড়ে তুলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। কারণ তিনি মনে করেন, নারীরাই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

বিউটি বর্তমানে কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমির আজীবন সদস্য পদে রয়েছেন। বিউটি আপার দুই ছেলে আফনান ও চিনান। সন্তানদের দেখভাল করা এবং শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক লেখালেখি বিশেষ করে কবিতা লেখেন। তার নিজের একটি কবিতা দিয়ে ইতি টানলাম...

'শ্রাবণের প্রথম দিন
সেই শ্রাবণের শুরুতে,
তুমি এলে মেঘাবরণে
নীলাকুঞ্জিতে আমার হৃদয়ের স্মরণে
আজো রয়েছো স্মৃতি হয়ে মনে।
একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল
তুমি দাঁড়িয়ে দরজায়
এই মন তোমায় দেখে
বিস্মিত হয়ে রয়।
লুখিয়ে রাখা গোলাপটি নিয়ে যাই
বললাম গোলাপ
তোমায় ভালবাসি তাই।
বৃষ্টির আড়ালে তুমি
শুধু বাঁকা চোখে তাকালে
বললে, কী হবে
আমায় কষ্ট দিয়ে।
আজো ভুলিনি
তোমার সেই চাহনি
সেই স্মৃতি মুর্চ্ছনা
বৃষ্টি জলকণা দিয়ে
তুমি নেই যখন
এলোমেলো ভাবনায় এই মন যেন আনমনা

অস্থির হয়ে রয় কুয়াশার ছায়ায় ।
অনেক কষ্ট পাওয়া আমার কল্পনা,
এমনই অপরাধ যদি ছিলো তবে আমায় বলো
আমার প্রিয় মানবী যার জন্য আজ তুমি সুন্দর
'মা' তোমার অনুপস্থিতিতে মনের গভীরে কষ্ট পেলো ।
কখনো ভুলবো না, তুমি কবে আসবে
যদি সত্যিই ভালোবাস তবে জানাবে
এই আমাকে .....
পৃথিবীকে ভুলে যেতে ইচ্ছে হয়
ভাবি যখন তোমাকে
কান্নায় এই মনের গভীর পুড়ছে
আনমনে শুয়ে ভাবছি ।
কী আনন্দ বাইরে
আছো সরে এত দূরে
আজ ঈদে হৃদয় পুড়ে মরে ।'

রিপু প্রভা নাথ: সময় এখন এগিয়ে যাওয়ার

মোহাম্মদ মাঈনুল ইসলাম

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া সদর পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের নাথপাড়া গ্রামের এক হতদরিদ্র হিন্দু পরিবারে সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে এই বসুধায় আগমন করেন রিপু প্রভা নাথ । সালটি ছিল ১৯৭৫ । বাবা দেবেন্দ্র নাথ একজন রিক্সাচালক ও মুড়ি-মুলা বিক্রেতা, আর মাছ বলা রাণী নাথ একজন গৃহিণী ।

পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে রিপু বাল্যকাল থেকেই কক্সবাজারে মামার বাড়িতে থাকতেন । তাই মামীর হাত ধরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া । ১৯৮৫ সালে কক্সবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিকের পাঠ শেষ করার পর রিপু চলে আসেন নিজ বাড়িতে । এরপর স্থানীয় একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন ষষ্ঠ শ্রেণিতে । কিন্তু পারিবারিক অসচ্ছলতা এবং পরিবার থেকে লেখাপড়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের উৎসাহ না থাকায় অষ্টম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় রিপুর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় ।

অভাবের সংসারে অর্থসংস্থানের লক্ষ্যে ১১ বছর বয়স থেকেই রিপু গ্রামে গ্রামে শীতলপাটি এবং মুড়ি-মুলা বিক্রি করতেন । এমনকি ১৭-১৮ বছর বয়স থেকে তাকে পরের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করতে যেতে হত । এভাবে চলতে থাকে রিপুর জীবন ।

মেয়ে বড় হলে বাবা-মার দুশ্চিন্তা । এ দুশ্চিন্তা কাটানোর উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে পেকুয়া উপজেলার শকুন্তলা গ্রামের বেকারির কারিগর বিমলের সাথে রিপুকে বিয়ে দেয়া হয় । কিন্তু ভাগ্য রিপুর অনুকূলে যায়নি । যৌতুক দিতে না পারায় স্বামীর সংসারে প্রতিনিয়ত মানসিক নির্যাতনের শিকার হতেন তিনি । তার মেয়ে টুম্পা গর্ভে থাকাবস্থায় তাকে তালাক দেয়া হয় এবং তার স্বামী কুতুবদিয়ায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন । বাবার বাড়িতে মেয়ে টুম্পাকে নিয়ে শুরু হয় রিপু কষ্টের জীবন । দুইবেলা অন্ন জোগাড়ের করার জন্য তিনি মানুষের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ঝিঁয়ের কাজ শুরু করেন ।

১৯৯৭ সালে রিপুর ভাই বিয়ে করার কিছুদিন পর তার বাবা, ভাই ও বৌদি তার উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করতে থাকে । কারণ বিয়ের পরে নাকি হিন্দু

মেয়েদের বাপের বাড়িতে সম্পত্তির কোনো অধিকার নেই। নির্যাতনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। একদিন রিপুকে তার বাবা, ভাই ও বৌদি মিলে বেদম প্রহার করে এবং তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রতিবেশীরা তাকে একটি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়। সুস্থ হওয়ার পর এক প্রতিবেশী নিলু বসাক তার বাড়িতে রিপুকে আশ্রয় দেন।

শারীরিকভাবে কিছুটা সুস্থ হলেও রিপুর দিনগুলো কাটতো বুক ভরা কষ্ট নিয়ে। এই কষ্টের সময় পাশে এসে দাঁড়ায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক। তাকে এক বছরের জন্য ভিজিডি কার্ড প্রদান করায় তার কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। রিপুর এই দুরবস্থা দেখে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হারুনুজ্জামান ভুঁইয়া তাকে চকরিয়া থানার অন্তর্গত হারবাং আশ্রয় প্রকল্পের একটি কক্ষ বরাদ্দ দেন এবং রিপুর একমাত্র মেয়ে টুম্পাকে স্থানীয় চকরিয়া কোরক বিদ্যাপীঠে আজীবন দশ টাকা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দেন।

এরপর রিপু দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর নারীনেত্রী শাহানার অনুপ্রেরণায় ২০০৮ সালে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৩০তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি আলোকিত সহজ পথের সন্ধান পান। অসহায়ত্ব কাটিয়ে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে এই প্রশিক্ষণ তাকে পথ দেখায়। তার মধ্যে নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন।

রিপু অল্প শিক্ষিত, কিন্তু জীবনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। সময়ের ব্যবধানে নারীনেত্রী শাহানার অনুপ্রেরণায় রিপু এখন একজন স্বাস্থ্য সেবিকা, মানবাধিকারকর্মী, আইন শিক্ষা সেবিকা এবং গণনাট্য দলের সভানেত্রী। রিপু এখন গ্রামের অসহায় নারী-পুরুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলছেন। এসব কাজের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত জীবনেও এসেছে সচ্ছলতা। জনসচেতনতামূলক গণনাট্য দলের বেশিরভাগ নাটকে মা সাজার কারণে চকরিয়া উপজেলার প্রত্যন্ত পাড়া-মহল্লার সবার কাছে রিপু পরিচিত "সখিনার মা" হিসেবে।

রিপু একাধারে কর্মনীড় নামের একটি স্থানীয় নারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী। বর্তমানে তিনি এ সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে রিপু এবং স্থানীয় নারীনেত্রীরা বিধবা ও বয়স্ক নারীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য, দক্ষতা বৃদ্ধি, পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ, ইভটিজিং, দুর্যোগ মোকাবিলা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ ন্যায়বিচার বঞ্চিতদের আইনি সহায়তা, কাউন্সেলিং এবং অ্যাডভোকেসি ইত্যাদি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছেন। মানব উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১০ সালে লাভ করেন স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার এবং ২০০৯ সালে লাভ করেন সমবায় পুরস্কার।

আজ রিপুর জীবনে নেই দুঃখ, নেই কষ্ট। মেয়ে টুম্পা এইচএসসি পাশ করে চাকরি করে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আইসিডিডিআরবিতে। মায়ের মতো টুম্পা-ও মনে করেন, নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য তারও কাজ রয়েছে। সে স্বপ্ন পূরণে এবং উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে টুম্পা বর্তমানে লেখাপড়া করছেন কক্সবাজার সরকারি কলেজে। সকল দুঃখ-কষ্ট ঘুচিয়ে আজ মা-মেয়ে দু জনে অনেক সুখী। থাকেন চকরিয়া থানা সেন্টারের ভাড়া বাসায়। তাই বলা যায়– এখন শুধুই তাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা।

রিপু প্রভা নাথ বিশ্বাস করেন, সবাই যদি তাদের কর্মশক্তিকে কাজে লাগাতে পারে তাহলে জীবনে পরিবর্তন আসবেই। এছাড়া সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন, তাহলে তার মতো আর কোনো নারী অত্যাচার ও অবহেলার শিকার হবে না, বরং দারিদ্র্যতাকে ধুয়ে মুছে জীবন যুদ্ধে হবে জয়ী।

অদম্য নারীনেত্রী শওকত জাহানের গল্প

মোহাম্মদ মাঈনুল ইসলাম

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার উপকূলীয় ইউনিয়ন ঢেমুশিয়া। এ ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামে দু সন্তান নিয়ে শ্বশুরবাড়ির ভিটায় বসবাস করেন নারীনেত্রী শওকত জাহান। স্বামী ফরিদুল হক ২০০৭ সালে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। স্বামীর রেখে যাওয়া অর্থ দিয়ে কিছুদিন দু সন্তান নিয়ে দু মুঠো ডাল-ভাত খেয়ে দিন কাটছিল শওকত জাহানের। এরপর দেখা দেয় নানা অভাব-অনটন। শওকত জাহান ভাবতে লাগলেন– কীভাবে সংসার চলবে, কীভাবে চলবে সন্তানদের লেখাপড়া।

২০১২ সালে তিনি বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বিষয়ক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১১৫তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শওকত জাহান জানতে পারেন– সমাজে নারীদের বিড়ম্বিত অবস্থা ও অবস্থানের কথা। তার মাঝে এ উপলব্ধি তৈরি হয়, নিজ কর্ম প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাতে পারলে যে কেউ দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হতে পারে এবং নারীরাও পুরুষের মত কাজ করে আয় করতে পারে। তাই প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার উপায় অনুসন্ধান করতে থাকেন শওকত জাহান ।

যেই ভাবনা সেই কাজ। সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ করেন তিনি। প্রথমদিকে কাজের অর্ডার কম পেলেও বর্তমানে স্থানীয় লোকজনের কাপড় সেলাই করে শওকত জাহান প্রতি মাসে গড়ে পাঁচ হাজার টাকা আয় করেন। তার কর্মপ্রচেষ্টা দেখে স্থানীয় অনেক বিধবা ও অসহায় নারীরাও অনুপ্রাণিত। অথচ কিছুদিন আগেও শওকত জাহান বাড়ির কোণে বসে অলস সময় কাটাতেন। আর এখন তিনি নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ার কারিগর। তিনি সমাজের মানুষকে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, পর্যাপ্ত সহযোগিতা পেলে নারীরাও পরিবার, সমাজ বা ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

নিজে স্বাবলম্বী হলে চলবে না– তাই আশপাশের নারীদেরকেও সচেতন ও স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। এমন চিন্তা থেকে নারীনেত্রী শওকত জাহান স্থানীয় অসহায় নারীদের বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তার একমাত্র স্বপ্ন– নারীরা যেন পুরুষের ন্যায় স্বাবলম্বী ও সম-মর্যাদার অধিকারী হয়ে সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

ছবি: স্থানীয় নারীদের বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন শওকত জাহান

শওকত জাহান 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ থেকে জেনেছেন প্রত্যেকটি মানুষের সমাজের প্রতি এক ধরনের দায় রয়েছে। তাই তিনি আত্মকর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি ওয়ার্ড অ্যাকশন টিমের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় ভূমিকা রাখছেন। তিনি শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ বন্ধ, গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি, গর্ভবতী নারীদের নিরাপদে প্রসব সেবা দেয়া-সহ বিভিন্ন কাজ করে চলেছেন। শওকত জাহান-সহ স্থানীয় স্বেচ্ছাব্রতী ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্রিয় উদ্যোগের ফলে ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন আজ অনেকটাই সামাজিক কুসংস্কারমুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে।

শওকত জাহান জানান, 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ তাকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তাকে শিখিয়েছে প্রতিটি মানুষেরই সমাজের প্রতি রয়েছে কিছু দায়বদ্ধতা। তাই সামাজিক কাজ করে তথা তিনি অন্য কারো মধ্যে সুখ দেখলে খুব খুশি হন। কারণ সমাজ উন্নয়নমূলক কাজগুলো করে মনের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ খুঁজে পান শওকত জাহান। তিনি মনে করেন, সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখে, তাহলে একদিন সমাজ থেকে দরিদ্রতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর হবে, মানুষ হবে আত্মনির্ভরশীল। গড়ে ওঠবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সুন্দর সুখী সমাজ। সেই সমাজ গড়ার লক্ষ্যেই সদা নিবেদিত আত্মনির্ভরশীল নারীনেত্রী শওকত জাহান।

বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেন জুলেখা আক্তার

জিল্লুর রহমান

পর পর দুই মেয়ে সন্তানের জন্মের পর তৃতীয় সন্তানের জন্মের সময় বাবা-মায়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল পুত্র সন্তানের। কিন্তু অনেক সময় মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক – তৃতীয় সন্তানও হলো মেয়ে। স্বভাবতই বাবা-মায়ের তৃতীয় মেয়ে জুলেখার জন্ম পরিবার তথা আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ছিল অনাহূত অতিথির আগমনের মতো উৎসবহীন।

চিত্রঃ শিশুদের হাত ধোয়ার কৌশল শেখাচ্ছেন জুলেখা আখতার

কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের সুখতলা নামক গ্রামে জুলেখা আখতারের জন্ম ১৯৯০ সালে। বাবা ছিলেন একটি জুতার কারখানার সাধারণ শ্রমিক। জমি-জায়গাও বলতে গেলে তেমন ছিল না। এরফলে আর্থিক অনটন ছিল তাদের পরিবারের নিত্যসঙ্গী।

বড় দুই বোনের লেখাপড়া করার সুযোগ না হলেও জুলেখাকে ১৯৯৫ সালে বাড়ির পাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। বিদ্যালয়ে নিয়মিত যেতে না পারা এবং সময়মত পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারার কারণে তার প্রাথমিক শিক্ষা সময়ে সময়ে বিঘ্নিত হয়। অবশেষে ২০০৩ সালে জুলেখা পঞ্চম শ্রেণি পাশ করেন। এরপর নিজের তাগিদ থেকেই জুলেখা আজগরা উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু তার পরিবার লেখাপড়ার কোনো খরচ বহন করতে সক্ষম ছিল না। সে সময় জুলেখা টিউশনির মাধ্যমে সামান্য আয় করে তার লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ করতে থাকেন। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে জুলেখা স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেলেও পরিবার হতে কোনোদিন উৎসাহ পাননি।

ঐ সময় থেকেই তিনি বুঝতে পারেন যে, পরিবার ও সমাজের সব জায়গায় ছেলেদের কদর বেশি। তখনকার সেই ছোট্ট জুলেখা নিজেকে প্রশ্ন করে, ছেলে-মেয়ে তো বিধাতার সৃষ্টি। কিন্তু পরিবার ও সমাজ কেন ছেলে-মেয়েদেরকে আলাদাভাবে দেখে? মানুষ গরীব বা ধনী হয় কেন? কিন্তু অনুসন্ধিৎসু জুলেখার কাছে তখনও এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।

এমনই এক সময় জুলেখা যখন মাত্র অষ্টম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় চার দিনব্যাপী উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (২২৬তম ব্যাচ) অংশ নেন। যদিও এ প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার জন্য যে বয়সসীমা ছিল, আয়োজকগণ তার আগ্রহ ও চিন্তার পরিণত অবস্থার কথা বিবেচনায় এনে বয়সসীমা শিথিল করে তাকে এ প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার সুযোগ দেন। মাথায় ঘুরতে থাকা অনেক প্রশ্নের উত্তর চারদিনের এ প্রশিক্ষণে পেয়ে যান জুলেখা। নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য নতুন করে শক্তি ও উৎসাহ পান তিনি। আজগরা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতীদের আয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আয়োজিত উঠান বৈঠকে উপস্থিত হন জুলেখা। তিনি তার নিজের বিভিন্ন কথা এসব উঠানে বৈঠকে তুলে ধরেন। এলাকার বয়স্ক নারী-পুরুষদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য পরিচালনা করেন একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র।

এরই মধ্যে জুলেখা ২০০৯ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি স্থানীয় হাজী আলতাপ আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হন। জুলেখার বাবা-মা বলতেন যে, মেয়েদের এত লেখাপড়া শেখার দরকার কী? তাদের ইচ্ছা ছিল মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া। কিন্তু জুলেখা লেখাপড়া চালিয়ে যান। ২০১১ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন তিনি। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে পারিবারিক সিদ্ধান্তে জুলেখাকে বিয়ে দেয়া হয় ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার গোসাইপুর গ্রামের দুলাল মিয়া নামের এক যুবকের সাথে।

বিয়ের এক বছর পর জুলেখার কোলজুড়ে আসে এক পুত্র সন্তান। কিন্তু স্বামী দুলাল মিয়া মোটেও বিশ্বস্ত ছিল না, বরং বিভিন্ন অনৈতিক কাজ করে বেড়াতো। জুলেখা শত চেষ্টা করেও তার স্বামীকে সঠিক পথে ফেরাতে না পেরে খুবই ভেঙে পড়েন এবং এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে যান। এমতাবস্থায় ২০১২ সালের ডিসেম্বরে অসুস্থ অবস্থায় তিন মাসের শিশুপুত্র-সহ পিতার গৃহে ফিরে আসেন তিনি। প্রায় ছয় মাসের চিকিৎসায় জুলেখা সুস্থ হন। এ সময় তিনি শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে জানতে পারেন যে, তাকে আর স্বামীর গৃহে ফিরিয়ে নেয়া হবে না। এতে জুলেখা স্তম্ভিত হয়ে যান, কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি।

চিত্রঃ প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা বিষয়ক উঠান পরিচালনা করছেন জুলেখা আখতার।

আত্মশক্তিতে বলীয়ান জুলেখা বাবা-মায়ের সংসারে গলগ্রহ না হতে কিছুটা ধাতস্থ হবার পরই নিজ তাগিদে স্থানীয় একটি এনজিও'র তত্ত্বাবধানে ঝরে পড়া শিশুদের নিয়ে পরিচালিত স্কুলে এক বছরের জন্য একটি চাকরি জোগাড় করেন। একইসঙ্গে তিনি পুনরায় লেখাপড়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন এবং লাকসামের নবাব ফয়জুন্নেসা ডিগ্রি কলেজে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন। আর নিজ এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের নামমাত্র বেতনে পড়াতে থাকেন। এর পাশাপাশি তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারীর সাথে সমন্বয় করে আজগরা ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে উঠান বৈঠক, কর্মশালা ও প্রচারাভিযান ইত্যাদি আয়োজন ও পরিচালনায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। স্থানীয় নারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'সুখতলা পল্লীসমাজ নারী উন্নয়ন সমিতি'। সমিতির সদস্যদের নিয়ে প্রতিমাসে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন রোধ, বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণ, নিরাপদ পানি পান, স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন, হাত ধোয়ার কৌশল ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ সম্পর্কে মানুষদের সচেতন করে তোলেন। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, যেখানে নারী নির্যাতন, সেখানেই তা প্রতিরোধে জুলেখা। নারী নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন জীবন গঠনের স্বীকৃতিস্বরূপ জুলেখা ২০১৪ সালে জয়িতা পুরস্কার লাভ করেন।

২০১৫ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে রাজধানী ঢাকার আদাবরে তিন দিনব্যাপী ১৮তম স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক (ভিটিআর) প্রশিক্ষণে অংশ নেন জুলেখা। এতে তার কাজের দক্ষতা বহুগুণে বেড়ে যায়। এছাড়া একই বছর তিনি নোয়াখালীর এনআরডিএস ট্রেনিং সেন্টারে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণেও (১৯৫তম ব্যাচ) অংশ নেন। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে জুলেখা সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা অর্জন করেন।

জুলেখা বর্তমানে তার এলাকার নারীদেরকে কাপড় সেলাই, ব্লক-বাটিক, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে ভূমিকা রাখছেন। এসব দক্ষ নারীদের অনেকেই অর্থনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে নিজ নিজ পরিবারে অবদান রাখছেন। এর মধ্যে দিয়ে জুলেখা ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘোচাতে ভূমিকা পালন করতে পারছেন।

জুলেখা আখতার জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক ও 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণই তার জীবনের গতি বদলে দিয়েছে, বাড়িয়েছে তার সাহস ও আত্মবিশ্বাস। তার স্বপ্ন, গ্রামের প্রতিটি নারীকে আয়মুখী কাজের সাথে যুক্ত করে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং সমাজ থেকে নারী নির্যাতন ও শিশুবিবাহ শতভাগ নির্মূল করে নারীর জন্য এক মর্যাদাপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা।

জনপ্রতিনিধি হওয়ার স্বপ্ন দেখেন মরিয়ম বেগম

জিল্লুর রহমান

কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার বাতাবাড়িয়া গ্রাম। এই গ্রামের দরিদ্র এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মরিয়ম বেগম। সাত ভাই বোনের মধ্যে মরিয়মের অবস্থান তৃতীয়। দরিদ্রতা সত্ত্বেও মরিয়মের বাবা তার মেয়ের মেধায় মুগ্ধ হয়ে ১৯৯১ সালে মরিয়মকে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। ১৯৯৬ সালে পঞ্চম শ্রেণি পাশের পর মরিয়ম ভর্তি হন খিলা আজিজ উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ে। কিন্তু মেধা এবং সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শুধু পিতার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সপ্তম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় মরিয়মের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনা তাকে খুবই বেদনাহত করে তোলে, শৈশবের দুরন্তপনায় বেড়ে উঠা বর্ণিল স্বপ্নগুলো তার কাছে বর্ণহীন ধুসর হতে থাকে, ভারি হয়ে উঠে তার চারপাশ।

চিত্র: প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা বিষয়ক উঠান পরিচালনা করছেন জুলেখা আখতার

মরিয়ম ভবিষ্যতে কোনো না কোনোভাবে পুনরায় লেখাপড়া শুরু করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। এরইমধ্যে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হওয়ার দু বছর পর মরিয়মের বিয়ে দেয়া হয় পার্শ্ববর্তী নাঙ্গলকোট উপজেলার আদ্রা ইউনিয়নের কাকৈরতলা গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক নুরুল আমিন-এর সাথে। যদিও তখন মরিয়মের বয়স ১৬ পেরোয়নি। বিয়ের পরের বছর অর্থাৎ ২০০১ সালে মরিয়মের কোল আলো করে জন্ম নেয় তার প্রথম সন্তান। সন্তানের চাঁদপনা মুখ তার বেদনার ক্ষত সারিয়ে তুললেও তিনি তার সংকল্পের কথা ভুলে যাননি। মরিয়ম তার স্বামীকে লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে তার স্বামীও তাকে পুনরায় স্কুলে ভর্তি করাতে সম্মত হন। এরই ফলশ্রুতিতে মরিয়ম ২০০১ সালে ভোলাইন বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করেন। স্বামী-সন্তান, ঘর-সংসার সব সামাল দিয়ে ২০০৫ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সময়ের পরিক্রমায় মরিয়ম আরও দু সন্তানের মা হন। এই সময় মরিয়মকে ঘর-কন্নার কাজে বিশেষ মনযোগী হতে হয়। সময় দ্রুত বয়ে যেতে থাকে...

স্বামী-সন্তান-সুখ ইত্যাদি সবকিছু থাকার পরও মরিয়ম যেন ঠিক স্বস্তি পান না, নিজের ভেতর কিসের যেন অভাব বোধ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে নারীদের অসচেতনতা মরিয়মকে সবসময় ভাবায়। তার চারপাশের নারীদের প্রতি নানান বৈষম্য, অধিকারহীনতা এবং সহিংসতা-সহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের ঘটনায় তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হন। মরিয়ম নারীদের প্রতি সকল ধরনের বঞ্চনা ও নির্যাতন বন্ধে ভূমিকা রাখার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তার আশা আর প্রাপ্তির হিসাবের ব্যবধান ক্রমেই যেন বাড়তে থাকে।

ছবি: নারীনেত্রীদের ফলো-আপ প্রশিক্ষণে বক্তব্য দিচ্ছেন মরিয়ম বেগম

এই রকম একটি অবস্থায় মরিয়ম ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আদ্রা ইউনিয়নের উজ্জীবক মো. রফিকুল ইসলাম-এর উদ্যোগে কাকৈরতলা গ্রামে আয়োজিত 'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ' বিষয়ক একটি উঠান বৈঠকে অংশ নেন। এ উঠান বৈঠকের আলোচনা তাকে মুগ্ধ করে, এ যেন তারই মনের কথা। তার মনে হয়, সমাজে নারী-পুরুষের সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধ করতে হবে এবং নারীকে দিতে হবে তার অধিকার।

এর পরের কয়েক মাসে মরিয়ম তার নিজ এবং পার্শ্ববর্তী কাকৈরতলা, ভোলাইন ও পুঁজকরা প্রভৃতি গ্রামগুলোতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতীদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি উঠান বৈঠকে উপস্থিত থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় মরিয়ম ২০১২ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় নোয়াখালীর এনআরডিএস সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৯৭তম ব্যাচ) অংশ নেন। এ প্রশিক্ষণের প্রতিটি আলোচনার মধ্যেই মরিয়ম যেন নিজেকে নতুন করে খুঁজে পান। নারীর অবস্থা এবং অবস্থানের বিশ্লেষণের মধ্য

দিয়ে তার চারপাশের সকল নারীর সত্যিকার দুর্দশার চেহারা তার কাছে পরিষ্কার হতে শুরু করে। পিতৃতন্ত্র ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক আলোচনা তার চিন্তার জগতকে নতুনভাবে নাড়া দেয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হয়। চারপাশের কদর্য চেহারা বদলানোর বোধ তাকে তাগিদ দেয়।

তিন দিনের প্রশিক্ষণ শেষে মরিয়ম গ্রামে ফিরে আসেন। এলাকার অন্য স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে তিনি তার এলাকায় বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বন্ধ, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, আর্সেনিকযুক্ত নলকূপ চিহ্নিতকরণ, স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন-সহ বিবিধ কাজের পরিকল্পনা করেন এবং এলাকার জনপ্রতিনিধি-সহ অন্যান্যদের যুক্ত করে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হন। মরিয়ম এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। মরিয়ম-এর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে নারীরা ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যাদের অনেকেই ইতোমধ্যে স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

২০১৫ সালের মে মাসে আদ্রার ভোলাইন বাজার স্কুল অ্যান্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয় চার দিনব্যাপী ২,২৩৮তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণ আয়োজনে সহযোগিতা করার পাশাপাশি মরিয়ম নিজেও এতে অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে মরিয়ম ও অন্যান অংশগ্রহণকারীগণ নতুন প্রত্যাশা ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ ওয়ার্ডের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের পরিকল্পনা করেন।

মরিয়ম দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় তার উদ্যোগে গড়ে তোলা সংগঠনের সদস্যদেরকে নিয়ে মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে দক্ষ করে তোলেন। একইসঙ্গে স্থানীয় নারীদের নিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। এর মাধ্যমে তাদের পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ-সহ অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জনের পথকে সুগম করে তোলেন মরিয়ম।

মরিয়ম এখন এলাকার সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একটি আস্থার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছেন। যৌতুক, বাল্যবিবাহ কিংবা পারিবারিক সহিংসতা যে সমস্যা হোক না কেন, যেন মরিয়মের কাছেই তার সমাধান। এলাকাবাসীর দাবির প্রেক্ষিতে মরিয়ম ভবিষ্যতে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মূলত সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে আরও এগিয়ে নেয়ার জন্যই তার এই পরিকল্পনা বলে জানান তিনি।

মরিয়ম বেগম দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একজন উজ্জীবক হিসেবে গর্ববোধ করেন। তিনি বলেন, উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি আলোকিত পথের সহজ সন্ধান পেয়েছেন। নারীকে পশ্চাৎপদতা থেকে তুলে আনতে এ প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলেও তিনি মনে করেন।

তিনি সবসময় স্থানীয় অসহায় নারীদের সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাতে চান। কারও ওপর নির্ভরশীল না হয়েই নিজের শক্তি আর সামর্থ্য দিয়েই অনগ্রসর নারীদের এগিয়ে নিতে চান, অবহেলিত নারীদের পাশে থেকে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনে শক্তি যোগাতে চান। তিনি মনে করেন, সমাজ থেকে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠা করা গেলে এবং সবাই যদি নিজ নিজ অবস্থান সমাজের উন্নয়নে কাজ করে তবেই গড়ে উঠবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

> *" আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত আছে। এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচব।"*
>
> **- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

অদম্য এক স্বেচ্ছাব্রতী হেলেনা বেগম রহিমা

মো. মামুন হোসেন

বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার লোহালিয়া গ্রাম। উন্নয়নের কিছুটা ছোঁয়া লাগলেও এখানকার অধিকাংশ মানুষই বাস করতো দারিদ্র্যসীমার নিচে। লেখাপড়ার ছিল না তেমন কোনো পরিবেশ, বিশেষ করে মেয়েদের। এখানকার মানুষের ধারণা ছিল যে, মেয়েদের অত লেখাপড়ার দরকার নেই। তাদের শুধু রান্নাবান্না শিখলেই হবে। এরকম এক অজপাড়া গাঁয়ে ১৯৭৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি দরিদ্র এক পরিবারে জন্ম নেন হেলেনা বেগম রহিমা। বাবা মো. আব্দুল জব্বার বেপারী একজন ভূমিহীন কৃষক এবং মা সামছুন্নাহার একজন গৃহিণী। বাবা-মা ছাড়াও পরিবারে ছিল তিন ভাই ও পাঁচ বোন (হেলেনা-সহ)। এত বড় পরিবারের ভরণ-পোষণ, তার ওপরে আবার সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগানো হেলেনার বাবার জন্য ছিল কষ্টসাধ্য বিষয়।

রহিমার শিক্ষাজীবন শুরু হয় বাবুগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন একটু ডানপিটে স্বভাবের। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন খেলায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন। চতুর্থ শ্রেণিতে থাকাকালীন পরীক্ষার ফি দিতে না পারায় লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তার। তখন পাশের বাড়ির এক চাচী পরীক্ষার ফি দিয়ে দেন। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার রহিমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। পরে তার এক বড় ভাইয়ের প্রচেষ্টায় আবার স্কুলে (বাবুগঞ্জ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়) যাওয়া শুরু হয় তার।

অষ্টম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় রহিমার বিয়ে হয়ে যায় একই গ্রামের ফারুক আহম্মেদ-এর সাথে। বিয়ের পরও লেখাপড়া চালিয়ে যান হেলেনা। ১৯৮৬ সালে তিনি এসএসসি পাশ করেন। একই বছর এক পুত্র সন্তানের জননী হন তিনি। এরপর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হলেও সাংসারিক ঝামেলার কারণে আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি রহিমার।

রহিমা বাল্যকাল থেকেই নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতেন, কখনো করতেন প্রতিবাদ। একবার কাবাডি খেলায় যখন কোনো মেয়েকে মাঠে নামতে দেয়া হচ্ছিল না, তখন তিনি নিজেই মাঠে নেমে পড়েন। তার মনে হতো, নারীরা কেন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে? তাদের কি কোনো স্বাধীনতা নেই?

সংসারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রহিমা একটি বেসরকারি সংস্থার স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তিনি দশটি রোগ যেমন, গর্ভবতী নারীদের টিকা, স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও পুষ্টির ওপর পরামর্শ দেন। সেবা পাওয়া থেকে কেউ যাতে বাদ না পড়েন তাও তিনি নিশ্চিত করেন।

নারীদের জন্য কাজ করতে গিয়ে তার বিভিন্ন ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় এবং নারীদের অসহায়ত্ব ও বঞ্চনা তাকে পীড়া দিত। বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বাল্যবিবাহ এবং নারীদের নির্যাতন তাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিত। এ সময় রহিমা পারিবারিক নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ রোধ ও ঝরে পড়া শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। নারীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে থেকেন। এসব কাজ করতে গিয়ে তিনি নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। স্থানীয় ধর্মীয় নেতারা বলেন, নারীরা কেন এসব করবে? তারা থাকবে ঘরের ভেতরে, তারা ঘরকন্না করবে। রহিমা তখন অনুভব করেন যে, সমাজের অসহায় নারীদের নিয়ে তার আশার প্রদীপটা মনে হয় নিভে যাচ্ছে। এরকম এক সময় তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বিষয়ক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (২৩তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তিনি নারীদের বঞ্চনার জায়গাগুলো ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। রহিমা ভাবেন, তিনি আর একা নন। মানুষের জন্য – বিশেষ করে সমাজের অবহেলিত নারীদের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন। প্রশিক্ষণের পর তিনি তার ইউনিয়নের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৮ জন নারীকে নিয়ে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর কমিটি গঠন করেন।

নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ গ্রহণের কিছুদিন পর রহিমা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণটি তার আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িয়ে দেয়। স্থানীয় নারীদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য তিনি বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস চাষ ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। রহিমা সম্মিলিত উদ্যোগে পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন এবং এতে তারা বিপুল পরিমাণে লাভবানও হন।

সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে রহিমার আগ্রহ দেখে এলাকার অনেকেই তাকে

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতে থাকেন। জনগণের উৎসাহে নির্বাচন করলেও প্রথমবার তিনি জয়লাভ করতে পারেননি। কিন্তু রহিমা হাল ছেড়ে দেননি। দ্বিতীয়বার ২০১১ সালে তিনি বিপুল পরিমাণ ভোট পেয়ে (প্রায় দু হাজার ২০০ ভোট) সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

চিত্রঃ প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা বিষয়ক উঠান পরিচালনা করছেন হেলেনা বেগম রহিমা

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তিনি সেখানে নারীদের অবমূল্যায়ন করার বিষয়টি লক্ষ করেন এবং এ অবস্থার পরিবর্তনে সংকল্পবদ্ধ হন। রহিমা-সহ প্রায় ছয় শ' ইউপি সদস্য একত্রিত হয়ে রাজধানী ঢাকার মালিবাগে সমাবেশের আয়োজন করেন এবং তাদের দাবিগুলো সেখানে তুলে ধরেন।

রহিমা ইউনিয়ন পরিষদের সেবাগুলো যেমন, নারীদের দুঃস্থ ভাতা, বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেন। তিনি তার এলাকায় বাল্যবিবাহ রোধে সক্রিয় রয়েছেন। যেখানেই বাল্যবিবাহের সংবাদ শুনতে পান, সেখানেই তিনি ছুটে যান। ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় রহিমা একটি সালিশী কমিটি গঠন করেছেন, যে কমিটির মাধ্যমে তিনি নারী নির্যাতন বন্ধে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখছেন রহিমা। তিনি নিজ উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের নিয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা বিষয়ক উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়গুলো হাতে-কলমে নারীদের বুঝিয়ে দেন।

রহিমা মনে করেন, নারীরা শিক্ষিত হলে তারা সচেতন হবেন। এ লক্ষ্যে স্থানীয় নারী ও ঝরে পড়া শিশুদের লেখাপড়া করানোর উদ্যোগে নেন তিনি। রহিমার প্রচেষ্টা ও উৎসাহে স্থানীয় অনেক নারীই এখন পড়তে ও লিখতে পারেন। এছাড়া রহিমার প্রচেষ্টায় অনেক নারী আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করেছেন, যারা এখন আর স্বামীর ওপর নির্ভরশীল নন।

রহিমার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাজ দেখে গ্রামের মানুষজন অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ। সময়ের ব্যবধানে গ্রামে সে কথাটি আর নেই যে, মেয়েদের বেশি লেখাপড়া করিয়ে কী লাভ? রহিমাকে কাজ করতে এখন কোনো সামাজিক এবং পারিবারিক বাধার সম্মুখীন হতে হয় না।

স্থানীয় নারীদের নিয়ে একটি একটি সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন রহিমা, যে সংগঠনের মাধ্যমে নারীরা সংঘবদ্ধ হবে, সঞ্চয় করবে এবং আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করবে।

অদম্য সাহস আর আত্মবিশ্বাসই হেলেনা বেগম রহিমার পথ চলার শক্তি, যা তিনি অর্জন করেছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক ও নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ থেকে। রহিমা এখন এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখেন যেখানে সবাই হবে আত্মনির্ভরশীল এবং সকলের থাকবে সমান অধিকার।

গংগাচড়ার সফল সংগঠক নাছিমা

চন্দ্র শেখর

দুই পাশে দুটো টিনের কাঁচা ঘর, ঘরের পাশে রান্না করার টিনের চালা। বাড়ির আঙ্গিনায় কয়েক রকম ফলের গাছ। বাড়িতে ঢুকেই কানে পড়লো ঝিক-ঝিক-ঝিক সেলাই মেশিনের শব্দ। বাড়িতে কেউ এসেছে এমন আন্দাজ করে ঘরের ভেতর থেকে বেড়িয়ে এলেন ৩০ বছর বয়সী এক নারী। খুবই অল্প লেখাপড়া জানা, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত পিছিয়ে পড়া একজন নারী, যিনি শুধুমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই নিজে সাবলম্বী হয়ে সমাজের অন্য দরিদ্র নারীদের ভাগ্যের পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বলছি নাছিমা বেগম-এর কথা, যিনি এখন কোলকোন্দ ইউনিয়নের সফল সংগঠক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে এক সংগ্রামী ইতিহাস।

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলা হতে পাঁচ কিলোমিটার দূরে কোলকোন্দ ইউনিয়নের দক্ষিণ কোলকোন্দ গ্রামে মানুষকে সংগঠিত করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সফল হয়েছেন এমনই এক সফল নারী মোছা. নাছিমা বেগম। বাবা মোসলেমউদ্দিন আর মা অহেতোন নেছা-এর তিন মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে নাছিমাই প্রথম সন্তান।

জীবনের রঙ্গিন স্বপ্নের ফুলগুলো পাপড়ি মেলতে না মেলতেই সপ্তম শ্রেণি পাশের পরই ২০০১ সালে ১৩ বছর বয়সে একই গ্রামের ১৮ বছর বয়সী এক বেকার যুবকের সাথে বিয়ে হয়ে যায় নাছিমার। জীবনের মানে না বোঝা এই নারীকে পরিবারের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিয়ে এক অজানা সংসারে শরিক হতে হয় স্বামী শাহজালালের সাথে। অনেক অজানা হতাশা উঁকি দেয় তখন নাছিমার মনে। পিতৃহারা স্বামীর সংসারে গিয়ে নাছিমা জানতে পারেন যে, অনটনের সংসার চালাতে গিয়ে তার স্বামী আগেই পৈতৃক সূত্রে পাওয়া মাত্র ২০ শতাংশ জমিও বন্ধক দিয়ে রেখেছেন। একমাত্র স্বামীর উপার্জনে বাজার থেকে চাল কিনে বাড়িতে এনে রান্না হতো তাদের খাবার। কখনো কম খেয়ে, অর্ধাহারে দিন কাটতে থাকে নাছিমার। দারিদ্র্যের কষাঘাতে বাস্তবতার মুখোমুখী থমকে দাঁড়ায় তার জীবন। অভাব নামের স্রোতনদী এমনিভাবে টেনে নিয়ে যায় নাছিমার সংসার জীবনের চারটি বছর।

বিয়ের চার বছর পরে ২০০৫ সালে নাছিমার সংসারে আসে এক নতুন মুখ। জন্ম নেয় ফুটফুটে এক কন্যাসন্তান। স্বামীর সংসারের দুরবস্থার কথা বাবার বাড়িতে জানান তিনি। মেয়ের জীবনের কিঞ্চিৎ সুখের কথা ভেবে দায়গ্রস্ত গরীব বাবা ১৫ হাজার টাকা তুলে দেন মেয়ে জামাতার হাতে। বাবার দেয়া টাকা পেয়ে অভাব ঘুচানোর নানা উপায় খুঁজতে থাকেন নাছিমার স্বামী। ৬ হাজার টাকায় ২০ শতাংশ জমি বন্ধক থেকে ছাড়িয়ে নেন। বাকি টাকায় অন্যদের কিছু আবাদি জমি বন্ধক নিয়ে চাষাবাদ শুরু করেন। কাটতে থাকে সংসারের অভাব।

সময়ের ব্যবধানে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন নাছিমা। স্বামীর সংসারে শ্বাশুড়ি, দুই সন্তান-সহ মোট পাঁচ সদস্যের পরিবার। এভাবে খাবারের মুখ যতই বেড়ে যায়, নাছিমার আশার স্বপ্নগুলো ততই ম্লান হতে থাকে। কীভাবে, কেমন করে কেবল স্বামীর উপার্জনে পাঁচ সদস্যের সংসার চলবে সেই ভাবনাই দিনরাত তাড়া করে বেড়ায় নাছিমার সরল মনকে। চোখের সামনে এতগুলো জীবন সংকটে পড়ে আছে, তার করার কিছুই নেই– এটাই শুধু তিনি জানেন। এভাবে নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেন তার বাস্তব জীবন।

কেটে যায় আরও কয়েকটি বছর। ২০১০ সালের আগস্ট মাসে নাছিমা জানতে পারেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণের কথা। বিপুল আগ্রহ নিয়ে তিনি উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১,৩৮৬তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন।

'নারী-পুরুষ সকলে মানুষ', 'নারীরাই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি'– ইত্যাদি শ্লোগান এবং নারীর অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক আলোচনাগুলো তার মানস পটকে আন্দোলিত করে। তিনি নিজের মধ্যে এক ধরনের আত্মশক্তি অনুভব করেন। তিনি অনুভব করেন, তার পক্ষে সম্ভব নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করা।

প্রশিক্ষণের পর নাছিমা সাবলম্বী হওয়ার জন্য টুপি সেলাইয়ের কাজ শুরু করে। অল্প পরিমাণে কাঁথাও সেলাই করতে থাকেন তিনি। এভাবে টুপি ও কাঁথা সেলাই থেকে তিনি প্রতিমাসে প্রায় এক হাজার টাকা আয় করেন। সাংসারিক কাজের পাশাপাশি এই কাজ করতে তাকে অনেক বেশি সময় পরিশ্রম করতে হত। নিজের লেখাপড়া না জানাটা যে তার উন্নতির জন্য কতবড় বাধা তা তিনি উপলব্ধি করেন।

এভাবে পথ চলতে চলতে একই গ্রামের গণগবেষক মনোয়ারার সান্নিধ্যে দরিদ্র ও

অসহায় মানুষদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেন নাছিমা। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে গড়ে তোলেন 'দক্ষিণ কোলকোন্দ উজ্জীবক গণগবেষণা সমিতি' নামে একটি সংগঠন। সংগঠনের ২৫ জন সদস্যই নারী। প্রত্যেক সদস্য প্রতি সপ্তাহে ২০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। সমিতির বর্তমান তহবিল ৬৮ হাজার সাত শ' টাকা। সকলের মতামতের ভিত্তিতে নাছিমা সমিতির কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লেখ্য, কোলকোন্দ ইউনিয়নে গণগবেষকদের উদ্যোগে প্রায় ১৫টি সমিতি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে যে সমিতিগুলো অত্যন্ত সফল নাছিমার সমিতি তার মধ্যে একটি। নাছিমা গণগবেষকদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গংগাচড়া উপজেলার বিভিন্ন সমিতির বৈঠকে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। সমিতির প্রতিনিধি সভাগুলোতে নাছিমা প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। অন্যদের আলোচনা থেকে নাছিমা যেমন শিক্ষা নেন, তেমনি নাছিমার আলোচনা থেকেও অন্যরা উপকৃত হন।

গণগবেষণা সমিতি গড়ে তোলার কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। এজন্য তাকে সফলভাবে কাজ করার মধ্য দিয়েই সকলের বিশ্বাস অর্জন করতে হয়েছে। তার মতে, সমিতি পর্যায়ে যদি সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া যায়, সকলের মতামতের ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, তবে সকলেই নিজেকে সমিতির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভাবেন। সমিতির টাকা স্বল্প লাভে সদস্যদের মাঝে ঋণ হিসেবে দেয়া হয়। এ কারণে তার সমিতির সদস্যরা এখন মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করেন না। শুধুমাত্র সঞ্চয় কিংবা ঋণ প্রদানকেই সদস্যরা সমিতির একমাত্র কাজ হিসেবে বিবেচনা করেন না। সমিতিতে এখন নিয়মিত গণগবেষণা চর্চা হয়। সমিতির সভায় তারা প্রত্যেক সদস্যের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বসানো হয়েছে কিনা এবং সকল সদস্যদের সন্তানেরা নিয়মিত স্কুলে যায় কিনা সে খোঁজ নেন। গর্ভবতী নারীসহ অন্যান্যরা যাতে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা পায় সে লক্ষ্যে তারা এলাকার মানুষকে সচেতন করেন এবং কমিউনিটি ক্লিনিকেও যোগাযোগ রাখেন। এছাড়া সমিতির সদস্যরা তাদের ওয়ার্ডে ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত ওয়ার্ডসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ ও প্রকল্প নির্ধারণে মতামত দেয়া-সহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সমিতির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নাছিমা ২০১৪ সালে ৩০ জন নারীকে নিয়ে একটি সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। তিনি নিজেও এই প্রশিক্ষণের একজন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। এই প্রশিক্ষণের পর থেকে তিনি কাপড় সেলাই শুরু করেন। বর্তমানে সেলাইয়ের কাজ করে তিনি প্রতিমাসে প্রায় তিন হাজার টাকা আয় করেন। তার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে স্থানীয় আরও চারজন নারী কাপড় সেলাই করে আয় করছেন।

সেলাই প্রশিক্ষণের পর নাছিমা ২০ জন নারীকে নিয়ে আয়োজন করেন চারদিনের টুপি সেলাই প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী নারীরা টুপি সেলাই করে টুপি প্রতি মজুরি হিসেবে ২৫০ থেকে ৩৫০ টাকা আয় করছেন। নাছিমা এই টুপিগুলো সংগ্রহ করে এজেন্টদের কাছে বিক্রি করেন।

তার সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেখে স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা তাদের কমিটিতে নাছিমা বেগমকে সদস্য নির্বাচিত করেছে। বর্তমানে তিনি এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং দক্ষিণ কোলকোন্দ মাঝাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির একজন কার্যকরী সদস্য।

নাছিমার প্রথম সন্তান পঞ্চম শ্রেণিতে এবং একমাত্র ছেলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। তার প্রত্যাশা– ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা। উপার্জনের টাকা দিয়ে তিনি সম্প্রতি বেশকিছু জমি লিজ নিয়েছেন। সর্বশেষ মৌসুমে তিনি ৯০ শতক জমিতে ধান লাগিয়েছেন। এখন তাকে আর মঙ্গা তাড়া করে না। সংসার জীবনে তিনি অনেকটাই তৃপ্ত।

নাছিমা বেগম বলেন, 'দরিদ্র মানুষেরা যদি নিজেদের ক্ষমতাকে বুঝতে পারে, নতুন করে স্বপ্ন দেখতে পারে, নিজেদের কাজের সাথে অন্যদের যুক্ত করতে পারে, নিজেদেরকে সংগঠিত করতে পারে তাহলেই তাদের পরিবর্তন সম্ভব।'

জীবনকে সার্থক করে তুলতে চান ফটো আপা

রাজেশ দে

গাইবান্ধা জেলার সাঘাটার নারীনেত্রী সুলতানা শামীমা বেগম। ডাকনাম ফটো। ফটো আপা নামেই যিনি ছোট-বড় সকলের কাছে পরিচিত। তিনি সমাজের পরিবর্তন বিশেষত নারী ও শিশুদের জীবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছেন। সমাজ উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শামীমা ইতোমধ্যেই জয়িতা সম্মাননা পদক-সহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড় শামীমা। ডাক্তার বাবার ইচ্ছে মেয়ে বড় হয়ে ডাক্তার হবেন। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল ভালো না হওয়ায় তা আর হয়ে ওঠেনি। শামীমা ১৯৮২ সালে বগুড়ার শেখ মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে অর্থনীতিতে স্নাতক (অনার্স) পড়াকালীন ১৯৮৬ সালের ১০ জুন তার নিজ গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের সাথে তার বিয়ে হয়। একই বছর ১৭ জুন তিনি কুয়াহাট শহীদ এইচ.আর.এম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সাংসারিক কাজ ও চাকরি করতে গিয়ে শামীমা আর নিয়মিত লেখাপড়া করতে পারেননি। পরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ পাশ করেন। চার সদস্যের পরিবারে তার স্বামী আব্দুর রাজ্জাক সাঘাটা ডিগ্রি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তার দুই ছেলে-মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে রংপুর কারমাইকেল কলেজ এ অনার্স শেষে মাস্টার্স করছে এবং ছোট ছেলে পড়ছে অষ্টম শ্রেণিতে।

২০১১ সালে রংপুরে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৬৯তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন শামীমা। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তার কাজের মাত্রা ও পরিধি অনেক বেড়ে যায়। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষের বৈষম্য টিকে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর কারণে।

প্রশিক্ষণের পর থেকে তিনি নারীনেত্রীদের ফলোআপ সভাগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। ফলোআপ সভার বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা বিশেষত নারীদের আইনি বিষয়গুলো তিনি আত্মস্থ করেন এবং এসব বিষয়ে তিনি তার এলাকায় উঠান বৈঠকের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নারীদের সচেতন করেন।

ছবি: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুলতানা শামীমা (ফটো আপা)

শামীমা বাল্যবিবাহ বন্ধে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় রয়েছেন। যাদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন তাদের অনেকেই এখন লেখাপড়া করছে এবং কেউ কেউ লেখাপড়া শেষ করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সফল ও হয়েছেন। এমন অনেকের মধ্যে একজন আঁখি আক্তার। ২০০৬ সালের কথা। আর্থিক অসচ্ছলতা ও সচেতনতার অভাবে সাঘাটা ইউনিয়নের কুয়াহাট গ্রামের জোবেদ আলী ও করিমন-এর শিশুকন্যা আঁখির বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ে হয়েই যেত, যদি না শামীমার কাছে এ সংবাদ না আসতো। শামীমা আঁখির বাবা-মাকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং মেয়ের লেখাপড়া চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। শামীমার কথা শোনার পর আঁখির বাবা-মা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং আঁখির বিয়ে বন্ধ করে দেন। সেই আঁখি সাঘাটার উদয়ন কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে এখন বগুড়ার নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার এ লেখাপড়া করছে।

গোবিন্দ গ্রামের সাজু মিয়ার মেয়ে সান্তনা। ভরতখালি গার্লস স্কুলের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী। ২৯ নভেম্বর ২০১৫ সালে বিয়ে ঠিক করেন তার বাবা-মা। এ খবরটি কানে আসা মাত্রই বিয়ের আসরে ছুটে যান শামীমা। গিয়ে দেখেন বিয়ের সমস্ত আয়োজন চূড়ান্ত। দু-পক্ষের সকল আত্মীয়-স্বজনও চলে এসেছেন। রান্না-সহ সব ধরনের আয়োজনই শেষ। কোনোভাবেই কোনো পক্ষ বিয়ে বন্ধ করবে না। এতে নাকি তাদের সামাজিক ও আর্থিক অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। শামীমা অভিভাবকদের বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বোঝানোর পাশাপাশি সান্তনার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বলেন। কিন্তু কোনোভাবেই কোনো কাজ না হওয়াতে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে ফোন করেন। তিনি

চেয়ারম্যানকে জানান, যদি এই বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে না পারেন তবে তিনি আইনি সাহায্য নেবেন এবং যে কোনো মূল্যে এই বাল্যবিয়ে বন্ধ করবেন। পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপে সান্তনা সেদিন বাল্যবিয়ের অভিশাপ থেকে রক্ষা পায়।

কখনো এমন হয়েছে যে, শামীমা দুপুরে গিয়ে অভিভাবকদের বুঝিয়ে বাল্যবিয়ে বন্ধ করে এসেছেন, কিন্তু রাতেই আবার খবর পেয়েছেন যে, রাতে সেই বিয়ে দেয়ার আয়োজন করা হয়েছে। এমনই একটি ঘটনা ঘটে বাঁশহাটা গ্রামের লিপি আক্তারের ক্ষেত্রে। লিপি আক্তার শহীদ এইচ.আর.এম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছিল। লিপির বাবা লতিফ মিয়া কম বয়সেই মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। খবর পেয়ে শামীমা ছুটে যান লতিফ মিয়ার বাড়িতে। লিপিকে বাল্যবিয়ে না দিতে বিভিন্নভাবে লতিফ মিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। লতিফ মিয়ার ভাষ্য হলো– পাত্র অনেক ভালো, এমন পাত্র তিনি হাতছাড়া করতে চান না। শামীমা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এ অবস্থায় বাল্যবিয়ে বন্ধ না করলে লতিফ মিয়াকে প্রশাসনের হাতে তুলে দেবার হুমকি দেন তিনি। ফলে সাময়িকভাবে বিয়ে বন্ধ হলেও সেই রাতেই চুপিসারে আবার বিয়ের আয়োজন করা হয়। গ্রামের এক লোকের কাছ থেকে ফোন পেয়ে আবারো ছুটে যান শামীমা। লতিফ মিয়াকে অনেক বুঝিয়েও ব্যর্থ হন তিনি। উপায় না দেখে শামীমা সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে ফোন দেন। বিয়ের আসরে উপস্থিত কাজী উপায়ান্তর না দেখে তার ভুল স্বীকার করেন। সেদিন এভাবেই বন্ধ হয় লিপিকে বাল্যবিয়ে দেয়ার দ্বিতীয় চেষ্টা। লিপি বর্তমানে নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে।

শামীমা নারীদের অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। গড়ে তোলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'নারী প্রগতি সংস্থা'। বর্তমানে ৫০ জন নারী সদস্য রয়েছেন এই সংস্থায়। এই সংস্থার উদ্যোগে নির্যাতনের শিকার, প্রতিবন্ধী ও অসহায় নারীদের নিয়ে সেলাই প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের তৈরি করা পাঞ্জাবী, ফতুয়া, থ্রি-পিস, ছোট বাচ্চাদের পোশাক এবং ঘরোয়া সৌখিন জিনিসপত্র তৈরি করে তা সাঘাটার বিভিন্ন দোকানে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়।

'নারী প্রগতি সংস্থা'র সদস্যরা এলাকায় বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বিরোধ মিমাংসা, গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরিতে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শামীমা ব্যক্তিগতভাবে স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন করতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচারাভিযান ও উঠান বৈঠক পরিচালনা করছেন। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও স্বাস্থ্য সচেতনতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেন তিনি। তার এলাকায় এখন প্রায় সবাই স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন এবং বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথার কুফল সম্পর্কে জানেন। অবস্থা এমন তৈরি হয়েছে যে, এলাকায় এখন আর এখন কোনো বাল্যবিবাহ হয় না।

ছবি: রাষ্ট্রীয়ভাবে নয়টি পদকপ্রাপ্ত নারীনেত্রী সুলতানা শামীমা (ফটো আপা)

এলাকায় জুয়া, গাঁজা ও মদ জাতীয় সকল নেশা প্রতিরোধে এবং ইভটিজিং প্রতিরোধেও নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন শামীমা। তিনি লক্ষ করেন, শিশু-কিশোরদের মাঝে বিভিন্ন অপরাধ করার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সব স্তরের শিশু- কিশোরেরা গাঁজা, জুয়া ও মদ-সহ বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হচ্ছে। স্কুলের নাম করে বাড়ি থেকে এসে মোবাইল হাতে রাস্তাঘাটে স্কুলগামী মেয়েদের উত্যক্ত করছে। তিনি এজন্য শুধু শিশু-কিশোরদেরকেই দায়ী করেন না, দায়ী করেন তাদের অভিভাবকদের অসচেতনতাকেও। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য অনুভব করেন, পুরোনো সু-চর্চাগুলো ফিরিয়ে আনার। অনুভব করেন, সুন্দর মানুষ হতে হলে যে সকল মানবিক গুণাবলী থাকা দরকার সেগুলো শেখাবার। এক্ষেত্রে শিক্ষক, বাবা-মা ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন তিনি। এই অবস্থায় শামীমা তৃণমূল পর্যায়ে একটি পাঠাগার গড়ে তোলেন। প্রতি শুক্রবার শিশু-কিশোরদের মাঝে বই পড়া ও পত্রিকা পড়া আসরের আয়োজন করেন তিনি। বছরে একবার বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, খেলাধুলার প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন শামীমা।

এলাকার পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য তিনি পুরো এলাকার খোঁজ-খবর নেন। ২০১৬ সালের ২২ জানুয়ারি। শামীমা খবর পান যে, কচুয়াহাট পশ্চিমপাড়ায় জুয়ার আসর চলছে এবং গাঁজা তৈরি ও বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ করছে না। তিনি পুলিশের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দেন। পুলিশ কয়েকদিন এসেও ধরতে পারে না তাদের। কী করে

যেন পুলিশ আসার আগেই খবর পেয়ে যায় অপরাধীরা। একদিন শামীমার কাছ থেকে গোপন সংবাদ পেয়ে নেশাখোরদের সবাইকে ধরে ফেলে পুলিশ। বন্ধ হয় নেশার আখড়া।

শামীমা সরকারের বিভিন্ন সেবা যাতে এলাকার দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষেরা পায় সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখেন। বিশেষত হাসপাতাল ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সম্পর্কে স্থানীয় নারীদের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতন করেন। গর্ভবতী নারীদের হাসপাতালে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করেন। প্রয়োজনে গর্ভবতী নারীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে মোবাইলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেন।

নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধেও সক্রিয় রয়েছেন শামীমা। আলাপ-আলোচনা ও মীমাংসার মাধ্যমে এ পর্যন্ত তিনি অসংখ্য পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়েছেন। ২০১৩ সালে ঘটে এমনই একটি ঘটনা। সাঘাটার বাসিন্দা রাহেলা বেগম বিয়ের পর কিছুদিন পর বুঝতে পারেন যে, তার স্বামী জুয়া খেলায় অভ্যস্ত। অনেক বুঝিয়েও স্বামীকে ফেরাতে পারছেন না। পরিণতি অশান্তি, ঝগড়া, বিবাদ। ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, রাহেলা বেগম ঠিক করেন স্বামী থেকে তালাক নেবার। সব শুনে শামীমা এগিয়ে আসেন। তিনি রাহেলার স্বামী কবির হোসেনের সাথে কথা বলেন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য অনুপ্রেরণা যোগান। কিন্তু কোনো কথাতেই কাজ হয় না। তখন তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার হুমকী দেন শামীমা। এরপর থেকে জুয়া খেলা থেকে বিরত রয়েছেন রাহেলার স্বামী। এখন রাহেলা তিন সন্তান নিয়ে সুখেই সংসার করছেন। আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করে পারিবারে সচ্ছলতা নিয়ে এসেছেন রাহেলার স্বামী।

শিক্ষকতা করতে গিয়ে সমাজের অবহেলিত বৃদ্ধদের নিগ্রহের ব্যাপারটি প্রকটভাবে শামীমার সামনে চলে আসে। একধরনের তাগিদ তৈরি হয় তার মাঝে। মনে মনে ভাবতে থাকেন যে, কিছু একটা করতে হবে। শামীমা লক্ষ করেন, প্রান্তিক বৃদ্ধ থেকে শুরু করে ধনী পরিবারের বৃদ্ধরাও চিকিৎসা সেবা, ভালোবাসা, মায়া, মমতা, শ্রদ্ধা ও অধিকার এ বিষয়গুলো হারিয়ে ফেলেছেন এবং ফেলছেন। বয়সের সাথে সাথে অতিরিক্ত বোঝা হয়ে উঠেছেন তাদেরই হাতে গড়া পরিবারে। অনেক ক্ষেত্রে ছেলের বাড়িতে স্থান না হওয়ায় তাদের মেয়ের বাড়িতে স্থান নিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। শামীমা তার সামাজিক দায়বোধের জায়গা থেকে এ সকল অবহেলিত মানুষগুলোর জন্য কিছু একটা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি যতদুর পারা যায় বিভিন্ন পরিবারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যান, যাতে কখনো এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি না হয়, যেন বৃদ্ধ বাবা-মাকে কখনো অবহেলিত হতে না হয়। ইতোমধ্যে যারা তাদের পরিবার থেকে নিগৃহীত হয়েছেন তাদের জন্য তিনি তার নিজ ২ বিঘা ৮ শতাংশ জমিতে একটি বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। কিন্তু ভাবা যতটা সহজ, কাজের ক্ষেত্রে ততটাই কঠিন। এতে প্রচুর টাকার দরকার। এত সহজেই দমে যেতে রাজি নন সুলতানা শামীমা। নিজের কয়েকটি গরু বিক্রি করে দেন তিনি। কাজ শুরু হয় বৃদ্ধাশ্রম গড়ার। টাকার সংকট কাটে না। ধরনা দেন নিজের কয়েকজন নিকটাত্মীয়ের কাছে– এই আশায় যদি কেউ সহযোগিতার হাত বাড়ায়। কিন্তু বারবার ফিরে আসেন খালি হাতে। কিন্তু যার মাঝে স্বপ্ন বীজ একবার বপন হয়েছে তিনি কখনো দমবার নন। সকলের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার পর তার স্বামীর সহযোগিতায় স্বামীর বেতনের টাকার উপর তিন লাখ টাকা ঋণ নিয়ে বৃদ্ধাশ্রম গড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূলের অদম্য এই নারীনেত্রী।

২০১২ সালে জুলাই মাসে কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত হন শামীমা। অপারেশনের পর তার বাম কিডনি একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। এই অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি সমাজের উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন নিরলসভাবে। নানান সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ফলে এলাকায় তার পরিচিতি ও সুনাম দুটোই ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে সাঘাটা উপজেলার সকল সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে শামীমা (ফটো আপা) খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি। স্থানীয়ভাবে কোনো কমিটি করলে তার নামটি প্রথমেই চলে আসে। তিনি সকলের আশা ও নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। স্থানীয় ২৯টি বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন শামীমা। তিনি বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক গাইবান্ধা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি ও সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক সাঘাটা ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি জয়িতা-সহ নয়টি রাষ্ট্রীয় পদক পেয়েছেন।

সুলতানা শামীমা, সবার প্রিয় ফটো আপা আজ একজন সফল নারী। 'একজন নারীর জীবনে এক একটা সফলতা যে কতটা আনন্দদায়ক, যে নারী সফল হয়নি সে কোনদিন অনুভব করতে পারবে না।' কিন্তু শামীমার কাছে সফলতা বড় বিষয় নয়, তিনি তার জীবনকে মানুষের উপকারে নিয়োজিত রেখে সার্থক করে তুলতে চান। তাইতো সমাজকে ভালোবেসে, দেশকে ভালোবেসে এবং সমাজের উন্নয়নে সদা অবদান রেখে চলেছেন সুলতানা শামীমা বেগম (ফটো আপা)।

আদর্শ গ্রাম তৈরির কারিগর নারীনেত্রী সুরাইয়া

পলাশ মন্ডল

নারীনেত্রী মোছাঃ সুরাইয়া বেগম। আদর্শ গ্রাম গড়ার এই কারিগর জন্মগ্রহণ করেন ১৯৭২ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর, রংপুর সদর উপজেলার পশুরাম ইউনিয়নের বাহাদুর সিংহ মাস্টার পাড়া গ্রামে। বাবা ছফর উদ্দিন, আর মা তহিরুন নেছা। দরিদ্র কৃষক বাবা ছয় সন্তান-সহ আট জনের পরিবারের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতেন। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে সুরাইয়া চতুর্থ। অল্প লেখাপড়া জানা বাবা-মা বিশেষ করে মা চাইতেন সন্তানরা লেখাপড়া শিখুক। তাই শত অভাব-অনটনের মধ্যেও ছয় সন্তানের লেখাপড়ায় কোনো কমতি রাখেননি মা তহিরুন নেছা।

ছোটবেলা থেকেই প্রথাগত নিয়মের বাইরে ছিল তার লড়াই। তার বয়সে অন্যান্য মেয়েরা যখন বাড়িতে মায়ের সাথে হাত বাটানো, গৃহস্থালী কাজ করতো সেখানে সুরাইয়া গাছে চড়া, নিজেদের ও অন্যের গাছের ফল চুরি করে বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করে খাওয়া, পুকুর থেকে মাছ চুরি করা, বাবা ও বড় ভাইয়ের পকেটের টাকা চুরি করে খাবার খেয়ে বেড়াতেন। দুষ্টুমীর পরিমাণ এতা বেশি ছিল যে, দরকারি খাতাপত্রও বিক্রয় করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না সুরাইয়া। কিন্তু এত কিছুর পরও তিনি লেখাপড়ায় বেশ মনোযোগী ছিলেন।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি বাবাকে হারান। বড় ভাই সংসারের হাল কাঁধে তুলে নেন। মা ও বড় ভাইয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে তাদের পরিবার চলতে থাকে। কিন্তু ছটফটে স্বভাবের সুরাইয়ার দুষ্টুমী একদমই কমেনি। একদিন তিনি তার এক প্রভাষকের একটি মূল্যবান বই চুরি করে বাজারের দোকানে ওজন দরে বিক্রয় করে খাবার ক্রয় করেন। অনেক প্রশ্নের পরেও তিনি বিষয়টি স্বীকার করেননি। কিন্তু দোকানদারের সন্দেহ হওয়ায় তার বড় ভাইকে বইটি সম্পর্কে অবহিত করেন। এ সময় বড় ভাই সুরাইয়াকে ভীষণ মারধর করেন। এই ঘটনাই তার চঞ্চল জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। পরবর্তী জীবনে সুরাইয়া হয়ে ওঠেন সৃজনশীল মানসিকতার একটি মেয়ে।

সুরাইয়া ১৯৮৮ সালে বুড়িরহাট দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন এবং ১৯৯০ সালে মিঠাপুকুর বালিকা স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। স্কুল জীবনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বেশ কয়েকবার বিজয়ী হন তিনি। অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালীন তিনি তার স্কুলে চার দিনব্যাপী আনসার বিডিপির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এসএসসি পাশের পরেই নারী পুর্নবাসন কেন্দ্র থেকে এক বছরব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ উদ্যোগে একটি সেলাই মেশিন করে আয় করতে শুরু করেন। সেলাই করেই তিনি তার নিজ ব্যয় নির্বাহ করতেন। সেলাইয়ের কাজে তার মাও তাকে সহযোগিতা করতেন। এসএসসি পাশের পর তিনি একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার স্কুল পরিদর্শক পদে যোগদান করেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি চাকরি ও সেলাইয়ের কাজ তাকে বেশ আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষার আগেই রংপুর সদর উপজেলার খলেয়া ইউনিয়নের লালচাঁদপুর গ্রামের মোঃ শহিদুল ইসলাম লেবুর সাথে ১৭ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়।

সাত ভাই-বোন আর মাকে নিয়ে স্বামী লেবুর বিশাল পরিবার। আর্থিক অসচ্ছলতা আর থাকবার অপর্যাপ্ত জায়গা; এমনি এক পরিবেশে শুরু হয় সুরাইয়ার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। স্বামী পরিবার চালাতে তামাকের ব্যবসা করেন। কিন্তু পরিবারের চাহিদা পূরণ করার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাধ্য হয়ে সুরাইয়া আবার ১৯৯৫ সালে স্কুল পরিদর্শক হিসেবে চাকরি শুরু করেন। এর মধ্যে তিনি ও তার স্বামী মিলে একটি টিনের বাড়ি তৈরি করেন। তাদের ঘরে আসে তিন সন্তান– এক মেয়ে ও দু ছেলে।

অভাব-অনটন, অশিক্ষা ও কুসংস্কারে ভরা গ্রামে তিনি টানা ১৪ বছর একটি স্কুল পরিচালনা করেন। স্কুল পরিচালনা ছেড়ে দেয়ার পর ২০১৩ সালে স্থানীয় এক ইউপি সদস্যের আমন্ত্রণে সুরাইয়া বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন নতুন রূপে। তিনি উপলব্ধি করেন, নারী হিসেবে পরিচিত হলেও মানুষ হিসেবে এই সমাজে তার অনেক কিছু করার আছে। শুরু হয় তার নতুন যাত্রা। বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন এ সামাজিক ব্যাধিগুলোকে তিনি এতদিন নিজেদের ভাগ্য ও সাধারণ ব্যাপার বলে ভেবে এসেছেন। কিন্তু এ প্রশিক্ষণ থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, এটি পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতারই ফল। এ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সচেতন করতে হবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে। সমাজের তথা গ্রামের পিছিয়ে পড়া অবহেলিত নারীদের এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাদের সচেতন ও শিক্ষার আলোয়

আলোকিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি নিজেকে গ্রামের নারীদের উন্নয়নের কাজে নিবেদিত করেন।

ছবি: উঠান বৈঠক পরিচালনা করছেন সুরাইয়া বেগম

শিক্ষার প্রসারে পুনরায় আগের স্কুল পরিচালনার ভার তিনি নিজ কাঁধে তুলে নেন সুরাইয়া। লালচাঁদপুর গ্রামের সব শিশুরা যাতে স্কুলে যায় সে লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। আনন্দলোক বিদ্যাপিঠ-সহ গ্রামের মসজিদভিত্তিক স্কুলে তিনি প্রায় ৩৫ জন ঝরেপড়া শিশুকে পুনঃভর্তি করিয়েছেন। সুরাইয়া স্বপ্ন দেখেন, গ্রামের কোনো শিশুই লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হবে না। ঝরেপড়া শিশুদের স্কুলে ভর্তির পাশাপাশি তিনি গ্রামের অভিভাবকদেরকে তাদের শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানোর গুরুত্ব বোঝান। এভাবে প্রায় ৪০ জন শিশুকে তিনি স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। সুরাইয়ার অদম্য উৎসাহ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এখন এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে, লালচাঁদপুর গ্রামে এমন কোনো পরিবার খুঁজে পাওয়া যাবে না যাদের সন্তান এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি।

শিশুদের পাশাপাশি বয়স্কদের শিক্ষার জন্যও তিনি কাজ করেছেন সবসময়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪ সালে নিজের লালচাঁদপুর গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন সুরাইয়া। এর মাধ্যমে ২৫ জন বয়স্ক নারীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন তিনি। শিক্ষার আলোর মুখ দেখিয়েছেন তাদের। তারা এখন পড়তে পারছেন, হিসেব করতে পারছেন। হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পাশাপাশি আরও দুটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় তিনি আরও ৫৫ জন নারীকে স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলেন।

সুরাইয়া গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলেছেন। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নিয়মিত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিয়ে আলোচনা করছেন। সরকারের বিভিন্ন সেবা যাতে এলাকার দরিদ্র পিছিয়ে পড়া মানুষেরা পায় সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখছেন। বিশেষত হাসপাতাল ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সম্পর্কে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে স্থানীয় নারীদের সচেতন করেন। গর্ভবতী নারীদের হাসপাতালে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। সুরাইয়ার পরামর্শে মাতৃত্ব ও প্রসবকালীন সেবা নিয়েছেন গ্রামের ১৬ জন গর্ভবতী নারী। এ কাজগুলো তিনি তার সামাজিক দায়বোধ থেকেই করছেন। সুরাইয়া নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রামের নারীদের সচেতন করে চলেছেন। মানুষদের বুঝিয়েছেন স্যানিটেশনের গুরুত্ব। তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ২০টি পরিবার তাদের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করেছে। এখন বাচ্চাদের খাওয়ার আগে ও পায়খানার পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া একটি চর্চায় পরিণত হয়েছে।

২০১৪ সালে ময়মনসিংহের আসপাডা ট্রেনিং সেন্টারে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত তিন দিনব্যাপী গণগবেষণা কর্মশালায় (৭৬তম ব্যাচ) অংশঅংশ করেন সুরাইয়া। এই কর্মশালা থেকে তিনি উপলব্ধি করেন, আত্মবিশ্বাসই সফলতার মূলমন্ত্র। প্রত্যেকের মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারলে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা সম্ভব হবে। তার এ আত্মোপলব্ধি থেকে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেন, গ্রামের নারীদের সংগঠিত করেন এবং তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। ৭০ জন নারীকে নিয়ে গড়ে তোলেন 'লালচাঁদপুর মহিলা গণগবেষণা সমিতি'। সাপ্তাহিক ১০ টাকা করে ৭০ জন নারীকে নিয়ে যে অর্থনৈতিক আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন সেটি ছিল তাদের দরিদ্রতা থেকে মুক্তির উপায়। তাদের উজ্জল ভবিষ্যত গড়া ও অর্থনৈতিক মুক্তির এ প্রয়াসকে এলাকার মহাজনী সুদের কারবারীরা কখোনোই ভালো চোখে দেখেনি। সংগঠনের নারীদের নামে সবসময় কটাক্ষ ও নানা গুজব ছড়াতে থাকে মহাজনী সুদের কারবারীরা ও তাদের সুবিধাভোগীরা। কিন্তু এতকিছুর মাঝেও সমিতির নারী সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ থাকেন।

সমিতির সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে ২০১৫ সালে ১ লাখ ১০ হাজার টাকার

ধান ক্রয় করে মজুদ করা হয়। কিন্তু হঠাৎ ধানের দাম কমে যাওয়ায় সমিতিকে প্রায় ২০ হাজার টাকা লোকসান গুনতে হয়। এই আর্থিক ক্ষতি আর মহাজনদের চক্রান্ত সমিতিকে হুমকীর মুখে ফেলে। একধরনের অসন্তোষ তৈরি হয় সমিতিতে। অনেকেই সমিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চায় এবং অংশীদারিত্ব চেয়ে বসে। এ অবস্থায় সুরাইয়া বেগম হাল ছেড়ে না দিয়ে ধৈর্য্য ধরে সমিতির সদস্যদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করেন। সমিতির সদস্যরা যাতে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তিনি সে ধরনের পরিবেশ তৈরি করেন। অবশেষে সমিতিটি রক্ষা পায়। সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেয়, তারা সমিতি ভাঙবেন না। কারণ, এই সমিতি তাদের বিপদের বন্ধু। সমিতি থাকায় হঠাৎ টাকার দরকার হলে এখন আর মহাজনের কাছ থেকে হাজার প্রতি মাসে তিন শ' টাকা হারে সুদে টাকা ধার করতে হয় না। এক সপ্তাহের জন্য সামান্য কিছু টাকার দরকার হলে সমিতি থেকেই নেয়া যায়। এটা তাদের একদিকে যেমন আর্থিক উপকার করছে, অন্যদিকে মনের জোর সৃষ্টি করছে।

সুরাইয়া বেগম লালচাঁদপুর গ্রামকে মহাজনী সুদের কারবার থেকে মুক্ত করতে চান। তিনি মহাজনদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কষাঘাতস্বরূপ লালচাঁদপুর গ্রামে ৩০ জন করে সদস্য নিয়ে আরও দুটি গণগবেষণা সমিতি গড়ে তুলতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এভাবে সুরাইয়ার নেতৃত্বে খলেয়া ইউনিয়নে লালচাঁদপুর গ্রামের প্রায় ১১০টি পরিবার এখন একসুতোয় গাঁথা। এরা সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সুদ থেকে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, অভাব, মহাজনের প্রভাব আর সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত লালচাঁদপুর এখন উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

লালচাঁদপুর গ্রামে এখন বাল্যবিবাহ নেই বললেই চলে। এ অর্জন এসেছে সুরাইয়া বেগমের হাত ধরে। সুরাইয়া বেগমের প্রচেষ্টায় বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে লালচাঁদপুর গ্রামের মোছাঃ হুমাইরা খাতুন। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তার বাবা আব্দুল হামিদ ও মা পেয়ারা বেগম তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। কিন্তু হুমাইরা এ বিয়েতে রাজি ছিল না। সে বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু করে। হুমায়রার মা সুরাইয়া বেগমকে বিয়ের দাওয়াত দিয়ে মেয়েকে একটু বুঝিয়ে বিয়েতে রাজি করানোর কথা বলেন। বিয়ের ব্যাপারটি সুরাইয়া বেগম জানতেন না। তিনি হুমায়রার বাবা-মাকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা মেয়েকে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অটল থাকেন। কিন্তু সুরাইয়া বেগম একবার যখন জেনেছেন তিনি ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি হুমায়রাকে ডেকে নেন এবং এলাকার উজ্জীবকদের নিয়ে এই বাল্যবিবাহ বন্ধের পরিকল্পনা করেন।

এক পর্যায়ে সুরাইয়া এবং উজ্জীবকদের পরিকল্পনা মোতাবেক হুমায়রা তার হবু শ্বশুরকে ফোন করে বলে যে, সে এ বিয়েতে সে রাজি নয় এবং বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সে আত্মহত্যা করবে। পরে সুরাইয়া বেগম হুমায়রার হবু শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সাথে কথা বলেন এবং তাদের বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে বোঝান। তার হবু শ্বশুরবাড়ির লোকজন বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং হুমায়রার বাবাকে বিষয়টি বুঝিয়ে মেয়েকে এখন বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। হুমায়রা বর্তমানে দশম শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে। তার স্বপ্ন লেখাপড়ার করে সে একদিন অনেক বড় হবে।

সুরাইয়া বেগম বিশ্বাস করেন, একতাই শক্তি। আর এটি এমন শক্তি, যার জন্য কোনো অর্থ লাগে না, শুধু একে অন্যের উপর বিশ্বাস রাখতে পারলেই হয়, অন্যের কষ্ট ভাগাভাগি করে নিলেই হয়। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তাদের সমস্বিত যেকোনো ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। এভাবে মানুষকে সংগঠিত করার মধ্যমে সুরাইয়া এখন গ্রামের মুরুব্বি থেকে শুরু করে শিশু পর্যন্ত সকলের কাছে আম্মা নামে পরিচিত। তিনি স্বপ্ন দেখেন, একদিন মানুষ নিজেদের মধ্যকার বিরোধ আর ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে একে অপরের পাশে দাঁড়াবে, আর সমাজ থেকে দূর হবে সকল সমস্যা। প্রতিটি গ্রাম হবে আদর্শ গ্রাম।

আম্বিয়া খাতুন: একজন সফল নারী উদ্যোক্তা

মো. আসাদুল ইসলাম আসাদ

মেহেরপুর জেলা সদর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন। ১৯৮৩ সালে এই ইউনিয়নের মিনাপাড়া গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আম্বিয়া খাতুন। বাবা আব্দুস সাত্তার এক বীর মুক্তিযোদ্ধা, পেশায় কৃষক, যিনি সামান্য জমি চাষ করে সাত জনের পরিবারের ভরণ-পোষণ যোগাতেন। আম্বিয়ার মা লুৎফুন্নেছা পেশায় একজন গৃহিণী। দু ভাই ও তিন বোনের মধ্যে আম্বিয়া সবার ছোট।

বহমান গ্রামীণ পরিবেশে দরিদ্রতার সাথে মোকাবিলা করেই বেড়ে উঠতে থাকেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই গ্রামের অন্য মেয়েদের তুলনায় একটু দুরন্ত ও আলাদা প্রকৃতির ছিলেন আম্বিয়া। পাড়ায় সঙ্গী ও সহপাঠীদের সাথে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ আর বনভোজনের পাশাপাশি গ্রামীণ আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজনের ক্ষেত্রে আম্বিয়ার ঝোঁক ছিল একটু বেশি। এই চঞ্চল মেয়েটির শিক্ষাজীবন শুরু হয় মিনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পর ১৯৯৫ সালে কুমারীডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন তিনি। ২০০০ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পাস করেন আম্বিয়া। এরপর গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হন তিনি।

শৈশবে আম্বিয়ার স্বপ্ন ছিল উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এলাকার পিছিয়ে পড়া নারী-পুরুষদের অগ্রসর করা জন্য আত্মনিয়োগ করা। কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে তা করা হয়ে উঠেনি তার। কিন্তু তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো গ্রামের দুঃস্থ ও বয়োজ্যেষ্ঠা ব্যক্তিদের খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদের যত্ন নেয়া।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াবস্থায় একই ইউনিয়নের বানিয়াপুকুর গ্রামের ইদ্রিস আলীর সাথে ২০০২ সালে বাবা-মায়ের ইচ্ছায় বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় আম্বিয়াকে। কঠিন বাস্তবতায় নিজেকে বিসর্জন দেন তিনি। যৌথ পরিবার হওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে অনেক কিছু সামাল দিতে হয় আম্বিয়াকে। স্বামীর বেকার জীবনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিজের নূন্যতম জীবন ধারণ ছাড়া লেখাপড়ার খরচ আশা করতে পারেননি তিনি। তবুও অনেক কষ্ট করে বাবার সহায়তায় ২০০২ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন আম্বিয়া। কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেননি। আর এভাবেই নিজের মনের ভেতরের অধরা স্বপ্নগুলো স্বপ্নই থেকে যায়। আম্বিয়ার স্বামীর আচরণ ইতিবাচক হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই তারা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেন। ২০০৪ সালে আম্বিয়ার কোলজুড়ে আসে প্রথম কন্যাসন্তান ইভা।

স্বামী, সন্তান ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন আম্বিয়া। এরমধ্যে যৌথ সংসারে দেখা দেয় নানান হিসাব-নিকাশ। এক পর্যায়ে সংসার টিকিয়ে রাখতে দেবর-ভাসুরদের নিকট থেকে আলাদা হতে হয় আম্বিয়া আর তার স্বামীকে। এ সময় সংসারে সম্বল ছিল মাত্র পাঁচ শ' টাকা। দিশেহারা না হয়ে আম্বিয়া উপার্জনের একটি উপায় খুঁজতে থাকেন। নিজেদের সামান্য জমিতে সবজি ও ধান চাষ শুরু করেন। স্বামী কৃষি জমিতে কাজ করেন, আর আম্বিয়া নিজ বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন করার পাশাপাশি টিউশন করে কোনোরকমে দিন পার করতে থাকেন।

এরমধ্যে একদিন পাশের গ্রামের ইউপি সদস্য নাজনীন আক্তার (চামেলী) আম্বিয়াকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। আম্বিয়া তার স্বামীকে নিয়ে উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১,৯৩০তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। চার দিনব্যাপী অনষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন-সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা শুনে আম্বিয়ার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। পূর্বের হারানো স্বপ্নগুলো নতুন করে দানা বেঁধে প্রত্যাশা আকারে ধারণ করে এবং উপায় খুঁজে পান পিছিয়ে পড়া নারী-পুরুষদের সংগঠিত করার অভিনব কৌশল।

এর কিছুদিন পর তিনি বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১১৩তম ব্যাচ) এবং গণ-গবেষণা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ফলে আম্বিয়ার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন আম্বিয়া। মা ও শিশুর পুষ্টি, জন্ম ও বিয়ে নিবন্ধন, ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়গামী করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি ও পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন আম্বিয়া। এলক্ষ্যে তিনি নিয়মিত উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভার আয়োজন করছেন।

ছবি: কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) উৎপাদন করছেন আম্বিয়া

আম্বিয়ার বিভিন্ন কাজের মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হলো বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ। তিনি এ পর্যন্ত টুলু, তৃপ্তি, সেলিনা ও সীমার মত আরও ১৪ জন কন্যাশিশুকে বাল্যবিবাহের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে গিয়ে তাকে অনেক সময় সামাজিকভাবে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি প্রথমে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করার চেষ্টা করেন। এতেও কাজ না হলে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্পৃক্ত করেন। তাতেও কাজ না হলে বাল্যবিবাহ বন্ধে প্রশাসনের শরণাপন্ন হন আম্বিয়া।

অবহেলিত নারীদের সংগঠিত করা এবং তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি গড়ে তোলেন 'হৃদয়ে মাটি ও মানুষ গণ-গবেষণা সমিতি'। সমিতির মোট সদস্য ২১ জন, যাদের মধ্যে ১৭ জন নারী এবং ৪ জন পুরুষ। বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে এক লাখ টাকা। উপজেলা সমবায় অফিস থেকে ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর সমিতির নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) করা হয়। এরপর সমিতির ১৭ জন নারী সদস্য-সহ পিছিয়ে পড়া স্থানীয় আটজন নারীকে নিয়ে মোট ২৫ জন সদস্যদের মাঝে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহায়তায় দু মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা সেলাই মেশিন ক্রয় করে বর্তমানে প্রতিমাসে দু হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা আয় করছেন।

২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় সমিতির সকল সদস্য ও স্থানীয় আরও কয়েকজনকে নিয়ে (মোট ২৫ জন) ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সমিতির কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করে সমিতির সদস্যরা গরু ক্রয় করেন এবং গরুর গোবর কেঁচো সার উৎপাদনে ব্যবহার করেন। সদস্যদের অনেকেই কেঁচো সার বিক্রি করে নিজ পরিবারে নিয়ে এসেছে আর্থিক সচ্ছলতা। আম্বিয়া নিজে বড় বড় পাঁচটি কেঁচো সার প্রকল্প তৈরি করেছেন। এই প্রকল্পের উৎপাদিত সার মাছ চাষ ও স্বল্প পরিসরে ধান ও সবজি চাষে ব্যবহার করেন। স্বামী ইদ্রিস আলী একজন উজ্জীবক হওয়ায় তিনিও এই সকল কাজ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। ইদ্রিস আলী দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি তার প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তার স্ত্রীর সাথে শেয়ার (বিনিময়) করেন। এর মাধ্যমে জৈব সার তৈরিতে আম্বিয়া দক্ষ হয়ে উঠছেন। ইতিমধ্যে আম্বিয়া স্বামীর সহায়তায় দুটি ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসকল প্রশিক্ষণে তিনি নিজের প্রকল্পের কেঁচো বিক্রয় করেন এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সম্মানী পেয়ে থাকেন। উপার্জনের ক্ষেত্র তৈরি হওয়ায় বর্তমানে স্বামী ও দু সন্তানকে নিয়ে বেশ সুখেই দিন অতিবাহিত করছেন আম্বিয়া।

বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে অর্জিত জ্ঞান তার জীবনের চাওয়া-পাওয়া ও লক্ষ্যে পরিবর্তন এনেছে। সামাজিকভাবেও আম্বিয়ার গ্রহণযোগ্যতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, সামাজিকভাবে অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন না

আসলে কখনই নারীদের জীবনে সুখময় পরিবর্তন আসে না, আসবে না। যে আত্মবিশ্বাস দিয়ে তিনি তার জীবনের পরিবর্তন এনেছেন, একইভাবে সমাজের অবস্থার পরিবর্তনেও তিনি কাজ করে যাচ্ছেন এবং করে যাবেন। তাই নিজে থেকে বদলে যাওয়া এবং মানুষকে বদলে দেয়ায় অন্যতম উদাহরণ এক নারী আম্বিয়া খাতুন। স্থানীয় নারী-পুরুষের কাছে যিনি একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত।

" শিক্ষা বিস্তারই এইসব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ! অন্ততঃপক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হবে! শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা কত পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা– যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভের সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতা-রূপে গঠিত করিবে! শিক্ষা– মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ী, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার নিমিত্তে নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে! তাহারা যেন অন্নযন্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।"

-বেগম রোকেয়া

মেহেরপুরের প্রতিবাদী নারী কণ্ঠ রহিলা বেগম

মো. আজিবার রহমান

মেহেরপুরের এক প্রতিবাদী নারী কণ্ঠের নাম নারীনেত্রী রহিলা বেগম। যে মেয়েটি ছোটবেলা থেকেই সমাজের মানুষগুলোর পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন, আর সে রহিলাই তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে প্রতিনিয়ত সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কীভাবে মানুষের উন্নয়ন করা যায় এ নিয়েই যেন সদা তার চিন্তা।

১৯৭৪ সালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নিভৃত পল্লী সাহারবাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন রহিলা। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন চৌকস, বুদ্ধিমতি ও প্রতিবাদী নারী। বাবা ভুলু মন্ডল-এর আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় মেয়েকে বেশিদূর লেখাপড়া করাতে পারেননি। ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন রহিলা বেগম।

হঠাৎ একদিন বান্ধবীদের সাথে খেলা শেষে বাড়ি ফিরে রহিলা দেখতে পান অপরিচিত কিছু মানুষ। বুঝতে পারেন তার বিয়ের বিষয়ে কথাবার্তা চলছে। এরপর জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভের আগেই বাবা-মায়ের সিদ্ধান্তে তাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়।

নতুন এক অধ্যায় শুরু হয় বিয়ের পর। কিন্তু এ অধ্যায়েও তাকে দেখতে হয় অভাব-অনটন। নিমিষেই শেষ হয়ে যাচ্ছিল তার স্বপ্নগুলো। কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় রহিলাকে। বছর কয়েক পরে রহিলার কোলজুড়ে আসে প্রথম কন্যাসন্তান। একদিকে সংসারে অভাব-অনটন, তার উপর শিশু সন্তানের বাড়তি খরচ। এমতাবস্থায় তিনি কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না রহিলা। স্বামীর সাথে পরামর্শ করে দু জনে নেমে পড়েন মাঠে, কৃষিকাজে। কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ঘরে তোলেন তারা। এতে কিছুটা অভাব লাঘব হলেও পুরোপুরি অভাব কাটেনি রহিলার।

কয়েক বছর পর তার কোলেজুড়ে আসে আরও দু কন্যাসন্তান। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় খরচও বাড়তে থাকে। এভাবেই অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে কাটতে থাকে রহিলার জীবন। এমন হতাশার দিনে রহিলা বেগমের সাথে দেখা

হয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোঃ আজিবার রহমানের সাথে। আজিবার রহমান রহিলাকে বলেন যে, তিনিও পারেন উপার্জন করতে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করতে। রহিলা তখন আজিবার রহমানের আমন্ত্রণে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি তাকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। নিজের জীবনের স্বপ্ন পূরণ আর নারীদের উন্নয়নে নানা পরিকল্পনা আঁকতে থাকেন তিনি। রহিলা সংকল্পবদ্ধ হন যে, তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াবেন এবং আশপাশের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের উন্নয়নে অবদান রাখবেন।

রহিলা প্রথমে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পরিকল্পনা নেন। এ লক্ষ্যে নিজ বাড়িতে ছাগলের খামার গড়ে তোলেন। এছাড়া তিনি ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) উৎপাদন করেন এবং বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করেন। আর এসব কাজের মধ্য দিয়ে রহিলা ইতোমধ্যে আত্মনির্ভরশীল একজন নারী হয়ে উঠেছেন।

নিজে ভাল থাকলে হবে না, আশপাশের মানুষগুলোকেও দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে তিনি গ্রামের নারীদের নিয়ে চারটি সমিতি গড়ে তুলেছেন। সমিতি গড়ে তোলার আগে তিনি সবাইকে সংঘবদ্ধ করেন এবং বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, অন্যের কাছ থেকে টাকা নেয়ার চেয়ে নিজেরা দলবদ্ধ হয়ে সঞ্চয় করা যায় এবং সেই টাকা দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করা যায়। সমিতি গড়ে তোলা ছাড়াও রহিলা আশপাশের অনেক দরিদ্র ও অসহায় নারীদের বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, ছাগল পালন, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহস জোগাচ্ছেন।

রহিলা 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার ও ব্যাধি যেমন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাড়া, গ্রাম ও মহল্লায় আলোচনা সভা, উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তিনি নিজ উদ্যোগে নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ২৫ জন বয়স্ক নারীকে স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তুলেছেন।

রহিলা এখন নিজেই স্বাবলম্বী ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে আছেন। তাকে দেখে এলাকার নারীরা অনুপ্রেরণার উৎস খুঁজে পান। রহিলার উজ্জ্বল আলোতে তাদের অনেকেই এখন আলোকিত।

> "পৃথিবীতে যাহারা সাহস করিয়া নিজের জীবন দ্বারা নব নব সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হয় তাহারাই সমাজকে বড়ো করিয়া তুলে। যাহারা কেবলই দিবি মানিয়া চলে তাহারা সমাজকে বহন করে মাত্র তাহাকে অগ্রসর করে না।"
>
> - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে রোজিনার এগিয়ে চলা

খোরশেদ আলম

সংসারের অভাবের কারণে যাকে একদিন সেলাই মেশিন বিক্রি করে দিতে হয়েছিল; সেই তিনি এখন নিজে স্বাবলম্বী এবং স্বাবলম্বী করে তুলছেন অন্য নারীদের। বলছি যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার দুর্বাডাঙ্গা ইউনিয়নের দত্তকোনা গ্রামের রোজিনা বেগমের (২৯) কথা।

জীবনকথা

রোজিনা বেগম জন্মগ্রহণ করেন ১৯৮৬ সালে, মনিরামপুর উপজেলার নেহালপুর ইউনিয়নের নেহালপুর গ্রামে। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে রোজিনা বেগম ছিলেন সবার ছোট। বাবা ছিলেন অতি দরিদ্র দিনমজুর। তার সম্পদ বলতে ছিল পাঁচ কাঠা আবাদি জমি এবং তিন কাঠা বসতবাড়ি।

ছবি: কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন করছেন রোজিনা বেগম

দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম

বাল্যকাল থেকেই লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল রোজিনার। কিন্তু দারিদ্রের কারণে অষ্টম শ্রেণির বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি তিনি। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে রোজিনা তাদের বাড়িতে বেশ কয়েকজন অপরিচিত মানুষকে দেখতে পান। প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও পরে কথাবার্তার মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, তার বিয়ের বিষয়ে আলোচনা চলছে। এরপর ২০০২ সালের জুন মাসে পারিবারিক সিদ্ধান্তে একই উপজেলার দত্তকোনা গ্রামের শফিকুল ইসলামের সাথে বিয়ে হয়ে যায় তার। বাল্যবিবাহের শিকার হন রোজিনা।

বিয়ের পর রোজিনার জীবনে শুরু হয় দারিদ্র্যের আরেক নতুন অধ্যায়। দিনমজুর স্বামীর স্বল্প আয়ের কারণে সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। স্বামীর আয় ছিল দৈনিক পঞ্চাশ টাকা হিসেবে প্রতিমাসে মাত্র দেড় হাজার টাকা। আর সম্পদ বলতে ছিল চার কাঠা আবাদি জমি এবং সাড়ে তিন শতক বসতবাড়ি। পরিবারে আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন রোজিনা। তাদের অভাবের সংসারে আসে দু পুত্র সন্তান–আল মামুন এবং আরাফাত হোসেন। এতে সংসারে বেড়ে যায় সদস্য সংখ্যা, বাড়তে থাকে অভাব-অনটন। সংসারের অভাব ঘোচাতে ২০০৫ সালে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে ১২ টাকা বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন তিনি। কিন্তু দু বছর পর স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তার নিজের কিছু জমানো টাকা দিয়ে ২০০৬ সালে একটি সেলাই মেশিন কিনেন রোজিনা এবং প্রতিবেশী এক চাচীর কাছে সেলাইয়ের কাজ শিখে এ কাজটি করতে থাকেন। কিন্তু অভাবের কারণে ২০১১ সালে তার একমাত্র সম্পদ সেলাই মেশিনটিও বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন।

সাফল্যের পথে পথচলা শুরু

২০১২ সালে হঠাৎ একদিন রোজিনার দেখা হয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী দীপক রায়ের সাথে। তার কাছ থেকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য শুনে রোজিনা উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিছুদিন পর (২১-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২) তিনি দুর্বাডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে আয়োজিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১,৯২৫তম) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'– এই শ্লোগান এবং এ সংক্রান্ত আলোচনা রোজিনাকে আকৃষ্ট করে। তিনি বুঝতে পারেন যে, জীবনে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে হলে আত্মবিশ্বাসী ও পরিশ্রমী হতে হবে।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে তিনি নিজ গ্রামে তথা পাড়ার পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করতে থাকেন। রোজিনা তার গ্রামের ১২ জন নারীকে নিয়ে 'হাসনা হেনা গণগবেষণা সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০ জন এবং সঞ্চয় নয় হাজার টাকা। সঞ্চয় করা ছাড়াও সমিতির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন

সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন, মা ও শিশুর পুষ্টি, ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া ও স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের শতভাগ স্কুলে ভর্তি এবং বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বন্ধে প্রচারাভিযান ও উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন।

কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন ও স্বাবলম্বিতা অর্জন

রোজিনা বেগম নিজের ও গ্রামের পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র নারীদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য পথ খুঁজতেছিলেন। কিন্তু পুঁজির অভাবে বড় কিছু করতে পারছিলেন না। ২০১৪ সালে রোজিনা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় আয়োজিত তিন দিনব্যাপী কেঁচো কম্পোস্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণে জৈব সার তৈরির বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন এবং জানতে পারেন যে, কেঁচো সার চাষের মাধ্যমে নিজের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রশিক্ষক হেলাল উদ্দিনের কেঁচো চাষের সাফল্য তাকে অনুপ্রাণিত করে। রোজিনা প্রশিক্ষণ থেকে বিনামূল্যে পাওয়া দশটি কেঁচো নিয়ে স্বল্প পরিসরে একটি চাড়িতে (মাটির পাত্র) কেঁচো চাষ শুরু করেন। সেই সময় বাড়তি কেঁচো কেনার মত নগদ টাকা তার হাতে না থাকায় বিনামূল্যে পাওয়া দশটি কেঁচোগুলোর বিশেষ যত্ন নেন, যাতে এ দশটি কেঁচো কোনভাবেই মারা না যায় কিংবা নষ্ট না হয়। নিবিড় পরিচর্যার ফলও তিনি পেয়েছেন। ধীরে ধীরে কেঁচোর পরিমাণ বাড়তে থাকে। বর্তমানে রোজিনার কেঁচোর চাড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১২টিতে দাঁড়িয়েছে। যেখানে কেঁচো আছে প্রায় দশ কেজি এবং এই কেঁচোর বাজার মূল্য ২৫ হাজার টাকা। এখান থেকে তিনি প্রতিমাসে তিন মণ সার পান, যেগুলো বাজারে বিক্রি প্রতি মাসে তার সাত হাজার টাকা আয় হয়। বাজারে বিক্রির পাশাপাশি তিনি নিজ জমিতেও কেঁচো সার ব্যবহার করছেন। এভাবে কেঁচো চাষ করে নিজ পরিবারে স্বচ্ছলতা নিয়ে এসেছেন রোজিনা। এছাড়া নিজের আয়ের জমানো ১৫ হাজার টাকা ও স্বামীর আয় থেকে জমানো দশ হাজার টাকা দিয়ে একটি গরু কিনেছেন তিনি।

রোজিনা বেগম স্থানীয় নয়টি সমিতিতে প্রতিমাসে দুই হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। ইতোমধ্যে সঞ্চিত ৮৫ হাজার টাকা দিয়ে ২০১৫ সালে ৪২ শতক কৃষিজমি বন্ধক নিয়েছেন। এ জমি থেকে গত বছর দুই বার ধান চাষ করে মোট ৬০ মণ ধান পেয়েছেন।

অন্যদেরও আলোর পথ দেখাচ্ছেন রোজিনা

নিজের সাফল্যের পাশাপাশি অন্যদেরও বিশেষ করে গ্রামের পিছিয়ে পড়া নারীদের কেঁচো চাষে উৎসাহিত করেন তিনি। তার অনুপ্রেরণায় আশপাশের তিন গ্রামের প্রায় ৫০ জন নারী-পুরুষ কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদন করছেন, যাদের অনেকেই এ কাজ করে নিজ নিজ পরিবারে নিয়ে এসেছেন সচ্ছলতা।

সাফল্যের সাথে সাথে বেড়েছে মর্যাদা

নিজের সাফল্য ও অন্যদের সহযোগিতা করায় পরিবার এবং সমাজে মর্যাদা বেড়েছে রোজিনার। তার পরিবারের সকল সিদ্ধান্ত তিনি ও তার স্বামী মিলে যৌথভাবে নেন। স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি ও দেবর-সহ পরিবারের সকলেই এখন তাকে নিয়ে গর্ব করেন। বাবার বাড়িতে ভাইয়েরাও এখন তাকে নিয়ে গর্ববোধ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামতের গুরুত্ব দেন। কিছুদিন আগে সাত হাজার টাকা দিয়ে বাবার চিকিৎসা করিয়েছেন রোজিনা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

রোজিনা ২০১৫ সালের ১৬-১৮ ডিসেম্বর যশোর আর.আর.এফ ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি তার মধ্যে তৈরি করে বড় পরিসরে নেতৃত্ব দেয়ার অনুপ্রেরণা। এ লক্ষ্যে তিনি ভবিষ্যতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সদস্য পদে প্রার্থী হতে চান। তিনি তার গ্রামের এবং পাশের গ্রামগুলোর পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র নারীদের স্বাবলম্বী ও অধিকার সচেতন করে তুলতে চান। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি নারীদের ডেকে এনে কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনের প্লান্ট ও সবজি চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করেন। তাদের মধ্যে যারা আগ্রহী হন তাদেরকে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনের প্ল্যান্ট করে দেন।

রোজিনা তার নিজের কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনের প্ল্যান্টটি আরও বড় করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। তার আরেকটি বড় ইচ্ছে হলো– দু সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। এসব পরিকল্পনার সবগুলো তিনি বাস্তবায়ন করতে পারবেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন। কারণ তার রয়েছে বিপুল আত্মশক্তি, যে আত্মশক্তি তিনি অর্জন করেছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে।

নারী নির্যাতন বন্ধে সোচ্চার বাসন্তী রাণী

রিতা পুরোকায়স্থ

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ৯নং আমতৈল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (তৎকালীন) রানা খান শাহিনের সহযোগিতায় স্বামীর সংসারে নির্যাতনের শিকার হওয়া বাসন্তী রাণী ফিরে পেলেন নুতন জীবন। ২০০৫ সালে রানা খান শাহিন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বাসন্তীকে সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হতে উৎসাহ যোগান এবং তাঁর সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতার কারণেই বাসন্তী রাণী নির্বাচিতও হন। নির্বাচিত হওয়ার পর কীভাবে জনগণের সেবা করা যায় এবং এর মাধ্যমে নিজেকে সমাজ সেবিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে পথও দেখিয়েছিলেন রানা খান শাহিন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টার ফলেই বাসন্তী আজ সমাজের মানুষের উন্নয়ন বিশেষ করে নারী নির্যাতন রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন।

চিত্র: স্থানীয় নারীদের অধিকার সচেতন করে তুলছেন বাসন্তী রাণী দাস

বাসন্তী রাণী দাস ১৯৭৩ সালের ২০ অক্টোবর হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার কাগাপাশা ইউনিয়নের মকা অলিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মৃত চন্দ্রমনি দাশ ও মা মৃত রাইমনি দাশ। পাঁচ বোন ও দুই ভাই-সহ মোট নয় সদস্যবিশিষ্ট বাসন্তী রাণীর পরিবার। তার বাবা পেশায় ছিলেন একজন কৃষক। মা ছিলেন গৃহিণী। নয় সদস্যবিশিষ্ট পরিবার চালানো বাসন্তীর বাবার পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। তাই মিলনপুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর বাসন্তীর আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার পর বাসন্তীকে তার বাবা বিয়ে দিতে প্রস্তুতি নেন এবং ১৯৯৩ সালের ২১ মার্চ রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নের বাসিন্দা মোহন লাল দাশের দ্বিতীয় পুত্র শ্রী গৌরাঙ্গ পদ দাশ-এর সাথে তার বিয়ে দিয়ে দেন।

বাসন্তীর স্বামী পেশায় একজন মিষ্টি বানানোর কারিগর ছিলেন। স্বামীর সামান্য আয়ের উপর নির্ভর ছিল শ্বশুর-শ্বাশুড়ি ও ননদ-সহ মোট পাঁচজনের সংসার। তারা বাসন্তীকে প্রথমদিকে মেনে নিলেও কিছুদিন পর শুরু করে নির্মম অত্যাচার। এভাবেই তার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। ১৯৯৫ সালে তার স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। তখন আরও যন্ত্রণা বাড়তে থাকে বাসন্তীর সংসারে। স্থানীয় মুরুব্বী ও ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হতে শুরু করে চেয়ারম্যান পর্যন্ত সবাই বিচার-সালিশ করেও এর কোনো সমাধান করতে পারেননি। বাসন্তীর উপর শ্বশুর-শ্বাশুড়ি-স্বামীর অত্যাচার ক্রমশ বাড়তে থাকে। এমনকি নির্যাতনের কারণে বাসন্তীকে হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়। কিন্তু বাবার বাড়ির অবস্থা ভাল না থাকার কারণে আইনের আশ্রয় নিতে পারেননি বাসন্তী।

কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাসন্তীকে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে বাবার বাড়িতে চলে আসতে হয়। বাসন্তী চলে এলেন পিতৃগৃহে, কিন্তু তার বাবার অবস্থা সচ্ছল না থাকায় সেখানেও তিনি বেশি দিন থাকতে পারলেন না। ছয় মাস পর চলে এলেন বড় বোন জ্যোৎস্না রাণী দাশ-এর বাড়িতে, মৌলভীবাজার সদর উপজেলার আমতৈল ইউনিয়নের সনকাপন গ্রামে।

বাসন্তী স্থির করলেন, সমাজের নারীদের আর নির্যাতনের শিকার হতে দেবেন না। এজন্য তিনি স্বেচ্ছায় পরিশ্রম করে যাবেন। ২০০১ সালের মার্চ মাস থেকে তিনি একটি বেরসকারি সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের উপর কাজ শুরু করেন। ২০০৩ সালে তিনি জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের কমিউনিটি নিউট্রিশন প্রমোটর-সিএনপি (স্থানীয়ভাবে 'পুষ্টি আপা' হিসেবে পরিচিত) পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পুষ্টি কার্যক্রমে চাকরির সুযোগ পেয়ে বাসন্তী রাণী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করারও সুযোগ পেয়ে যান। নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহের উপর কাজ করতে করতে বাসন্তী রাণী সকলের নিকট পরিচিতি লাভ করেন।

২০০৫ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া পর আত্মশক্তি বৃদ্ধির আলোচনা এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নারীর পশ্চাৎপদতাই দায়ী – এমন আলোচনা তাকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি যেন নতুন পথের দিশা পান। শুরু হয় নিজেকে এবং সমাজকে পাল্টাবার পালা। প্রশিক্ষণের কিছুদিন পর জনগণের সেবা করার ব্রত নিয়ে বাসন্তী রাণী আমতৈল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (তৎকালীন) রানা খান শাহিনের সহযোগিতায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

২০০৯ সালে তিনি 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে বাসন্তী রাণী জানতে পারেন বর্তমান সমাজে নারীর বাস্তব চিত্র। তিনি উপলব্ধি করেন, আমাদের সমাজের নারীরা এখনও অনেক পিছিয়ে। তার মতো অসংখ্য নারী ঘরে-বাইরে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ ও নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর থেকে বাসন্তী বাল্যবিবাহ বন্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে থাকেন। যেখানে বাল্যবিবাহের সংবাদ শুনতে পান সেখানেই ছুটে যান তিনি। যেমন, ৪নং ওয়ার্ডের কানাইলাল দাশ-এর মেয়ে পপি রাণীকে বাল্যবিবাহের হাত হতে রক্ষা করেন বাসন্তী রাণী। ২০১৩ সালের মার্চ মাসে ১৪ বৎসর বয়সী পপি রাণী দাশ-এর বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। বাসন্তী খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে পপির বাবা-মাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু পপির বাবা তার কথায় মোটেই কর্ণপাত না করে বাসন্তীকে অপমান করেন। বাসন্তী রাণী তখন স্থানীয় ইউপি সদস্য ও পরিষদের চেয়ারম্যানের সাহায্য নেন। পরিষদের চেয়ারম্যান সুজিত চন্দ্র দাশ সেখানে উপস্থিত হয়ে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে পপির বিয়ে বন্ধ করেন এবং তাকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এভাবে বাসন্তীর প্রচেষ্টায় বন্ধ হয় পপির বাল্যবিবাহ, টিকে থাকে লেখাপড়া করে তার বড় হওয়ার স্বপ্ন। পপি রাণী বর্তমানে একাদশ শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে। বাল্যবিবাহের মত যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন বাসন্তী রাণী।

বাসন্তী বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা থেকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে নিজ বাড়িতে একটি পাঠাগার দিয়েছেন, যেখানে নানান ধরনের গল্প-উপন্যাসের বই রয়েছে। গ্রামের ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন বয়সের মানুষকে সামান্য টাকা ভাড়ার বিনিময়ে এসব বই পড়তে দেন। এছাড়া বর্তমানে তিনি এফআইআরডিবি-এর অধীনে দরিদ্র জনগণের মধ্যে গর্ভকালীন সেবা দেয়ার কাজ করে যাচ্ছেন। এই চাকরি থেকে তিনি প্রতি মাসে পাঁচ হাজার বেতন পান। এভাবেই সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নিজের অবস্থারও পরিবর্তন করেছেন বাসন্তী রাণী। তিনি সনকাপন গ্রামে ১৫ শতক জায়গা ক্রয় করেছেন এবং সেখানেই নিজের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন।

২০১৫ সালের ১৫ জুন মাসে উপজেলা মহিলা সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন বাসন্তী রাণী। বাসন্তী মনে করেন, তার দ্বিতীয়বারের মত জন্ম হয়েছে। বিগত দিনের কথা স্মরণ করে তিনি জানান, তার জীবনে এমন সুখ আসবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। এক সময় ছিলেন চরম হতাশাগ্রস্ত। কিন্তু আজ আর পরনির্ভরশীল নন তিনি। বাকি জীবনটুকু সুখে-শান্তিতে এবং মানুষের সেবায় কাটিয়ে দিতে চান এই অদম্য নারী।

> "পৃথিবীতে যাহারা সাহস করিয়া নিজের জীবন দ্বারা নব নব সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হয় তাহারাই সমাজকে বড়ো করিয়া তুলে। যাহারা কেবলই দিব্বি মানিয়া চলে তাহারা সমাজকে বহন করে মাত্র তাহাকে অগ্রসর করে না।"
>
> - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমঙ্গলের জয়তুন: এক সংগ্রামী নারী

এস.এ হামিদ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি পাহাড়, টিলা, চা বাগান, হাওর ও সমতল ভূমি নিয়ে গঠিত মৌলভীবাজার জেলা। এ জেলার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপূর শ্রীমঙ্গল উপজেলা। কথিত আছে কোনো এক সময় এ এলাকার হাইল হাওর নামক স্থানে দুই ভাই বসত শুরু করেন। একজনের নাম ছিল শ্রী দাস ও অপর জনের নাম ছিল মঙ্গল দাস। তাদের নামানুসারে উপজেলার নামকরণ করা হয় শ্রীমঙ্গল। এই উপজেলায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের বাস। রয়েছে দরিদ্রতা ও কুসংস্কার-সহ বিভিন্ন সমস্যা।

এই উপজেলার শ্রীমঙ্গল সদর ইউনিয়নের উত্তরসুর গ্রামের একজন নারীনেত্রী জয়তুন্নেছা। নিজেকে আদর্শ নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রবণতা যার মধ্যে তীব্র। সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য, নারী নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করা এবং সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি, সুশাসন, স্বচ্ছতা- জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে লড়াই করে চলছেন তিনি।

জয়তুনের জন্ম ১৯৭৩ সালে ১ জানুয়ারি নিম্ন মধ্যবিত্ত এক পরিবারে। বাবা মৃত খুরশেদ আলী একজন কৃষক, মা জান্নাতুল বেগম একজন গৃহিণী। আট ভাই-বোনের মধ্যে (চার ভাই ও চার বোন) জয়তুন সবার বড়। স্থানীয় মনাই উল্লা দ্বিপাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর সংসারের অভাব-অনটন ও সামাজিক কুসংস্কারের কারণে তার পক্ষে আর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়নি।

১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভের আগেই (১৫ বছর ৩ মাস বয়সে) পারিবারিক সম্মতিতে আপন চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয় জয়তুনের। ৫০ হাজার টাকা নগদ কাবিন ও আধা ভরি স্বর্ণ এবং ১৫ শতক ভূমি রেজিস্ট্রি করে জয়তুনকে দেয়ার কথা থাকলেও বিয়ের পর আর কিছুই দেয়া হয়নি জয়তুনকে। তার ওপর স্বামীর সংসারে ছিল অভাব-অনটন। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটতে থাকে জয়তুনের। বিয়ের প্রায় এক বছর পর জয়তুন এক পুত্র সন্তানের জননী হন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। সন্তানটি ছিল প্রতিবন্ধী (একটি পা ছিল না)। জয়তুনকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে অসুস্থ হয়ে সন্তানটি মারা যায়। প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম দেয়ার কারণে জয়তুনের উপর শুরু হয় নানা লাঞ্ছনা এবং তাকে ঘিরে চলে নানা কুসংস্কারমূলক আলোচনা। কিন্তু সব নীরবে সহ্য করতে হয় জয়তুনকে।

১৯৯৩ সালে দ্বিতীয় এবং ১৯৯৫ সালে তৃতীয় পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তিনি। অভাবের সংসারে বেশিদূর পড়া হয়নি বড় ছেলে আবুল খায়ের-এর। অষ্টম শ্রেণি পাশের পর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে ২৩ বছর বয়সী আবুল খায়ের পরিবারের আহার জোগাতে টমটম গাড়ি চালান। জয়তুনের দ্বিতীয় ছেলে মো. জবলু মিয়া (১৮) শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে।

১৯৯৫ সালে দ্বিতীয় সন্তান জন্ম নেয়ার পর পরিবারে অভাব দেখা দেয়। দৈহিক শ্রম ছাড়া পরিবারের আয়ের কোনো উৎস ছিল না। বেকার স্বামীর কোনো কাজে নেই দক্ষতা, নেই কর্ম করার কোনো ইচ্ছেও। এ কারণে শ্বশুর-শ্বাশুড়ির পরিবার থেকে তাদের পৃথক করে দেয়া হয়। জয়তুনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মত অবস্থা হয়। বাচ্চা লালন-পালন, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক খরচ মেটানোর কোনো উপায় ছিল না। অভাবের সংসার, স্বামীর বেকারত্ব, চরম দারিদ্র্য জয়তুনকে দিশেহারা করে তোলে। অন্যদিকে বেকার স্বামী তার কাছে প্রতিনিয়ত যৌতুকের দাবি উত্থাপন করে। এর জন্য জয়তুনের উপর চালায় নিরব নির্যাতন। তখন জয়তুন বেঁচে থাকার জন্য এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫ জন শিশু শিক্ষার্থীকে দু বেলা করে প্রাইভেট পড়ানো শুরু করেন। এতে তার প্রতি মাসে সাতশ' থেকে আটশ' টাকা উপার্জন হয়। তখন বেকার স্বামী যৌতুক ও তার উপার্জিত টাকা নেয়ার জন্য নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। এমনকি দ্বিতীয় বিয়ে করার হুমকি দেয়। এ বিষয়ে পারিবারিকভাবে অনেক বিচার সালিশ হয়। কিন্তু কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

১৯৯৭ সালে এলাকায় কর্মরত (এফডব্লিউএ) লক্ষী রাণী পাল-এর সহযোগিতায় কমিউনিটি হেলথ ভলান্টিয়ার (সিএইচভি) হিসেবে মাঠপর্যায়ে কাজ শুরু করেন জয়তুন। তার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা যেমন, ইনজেকশন, স্যালাইন পুশ করা, ওজন ও প্রেসার দেখা, গর্ভবর্তী মা ও স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং নিরাপদ ডেলিভারি, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ও ব্যবহার সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া এবং কিছু কিছু

উপকরণ বিক্রি করা শুরু করেন। এতে তার কিছু আয়ের ব্যবস্থা হয়।

১৯৯৮ সালে জয়তুন-এর স্বামী যৌতুক পাওয়ার লোভে জয়তুনকে না জানিয়ে গোপনে একই গ্রামের তসলিম মিয়ার মেয়ে মর্জিনা বেগমকে বিয়ে করে ফেলে এবং মর্জিনার বাড়িতেই বসবাস করতে থাকে। এদিকে জয়তুন তার স্বামীর বাড়িতে স্বামীর তিন শতক ভূমির উপর একখানা কুড়েঘরে দু সন্তান নিয়ে খেয়ে না খেয়ে বসবাস করতে থাকেন। ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য তিনি প্রথমে স্থানীয় এনজিও সংস্থা শ্রীমঙ্গল ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক তাহেরা খানম-এর শরণাপন্ন হন। তার সহায়তায় শ্রীমঙ্গল থানায় তার স্বামীর বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তখন তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান ঘটনার সত্যতা পান এবং শ্রীমঙ্গল সদর ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান দুদু মিয়াকে ঘটনাটি নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্ব দেন। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিবাহের কিছুদিন পর স্বামী জয়তুনকে দু সন্তান-সহ তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে ১৯ দিন তাকে বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। অবশেষে ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ দুদু মিয়া, ইউপি সদস্য তাহের আলী, আলম উদ্দিন, মনির মিয়া, পুলিশ কর্মকর্তা মারুফ আহমেদ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মিলে স্থানীয় সালিশের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন। গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করার অপরাধে জয়তুনের স্বামী মহিবুল হাসানকে নিজ বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয় এবং তার তিন শতক ভূমির উপর মাটির দেয়ালবিশিষ্ট কুড়েঘর ও ভূমি জয়তুনকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। এখন পর্যন্ত জয়তুন নিরাপদেই এই বাড়িতে বসবাস করছেন।

বাড়ি বুঝে পাওয়ার পর জয়তুন একটি এনজিওতে স্থানীয়ভাবে পুষ্টিকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ ১২ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তিনি এনজিওতে চাকরি করেন। পাশাপাশি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে হাঁস-মুরগি, পশু পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম শুরু করেন। এসব কাজ করে যা আয় হয় তা দিয়ে সংসারের খরচ ও সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে যান এবং কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে থাকেন। জয়তুন কিছুদিন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশা-তে কাজ করেন।

২০১০ সালে নারীনেত্রী সৈয়দা আরমিনা আক্তার-এর কাছ থেকে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হন। তিনি বুঝতে পারেন, ক্ষুধামুক্ত সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি।

একই বছর জয়তুন শ্রীমঙ্গল ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১০৩তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তিনি নিজের মধ্যে আত্মশক্তি অনুভব করেন এবং সমাজের অসহায় মানুষের উন্নয়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের তাগিদ অনুভব করেন। জয়তুন প্রশিক্ষণ শেষে পরিকল্পনা করেন যে, প্রথমে নিজেকে সাবলম্বী করে তুলতে হবে এবং একইসঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নের নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে হবে। এই লক্ষ্যে তিনি ২০১১ সালে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেন। যেই ভাবা সেই কাজ। নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা হওয়ার পর এলাকার নারী-পুরুষ দল দলে সংগ্রামী জয়তুনকে সমর্থন দেয়, এমনকি তারা নির্বাচনের সকল খরচও যোগান দেয়। নারী স্বেচ্ছাব্রতীরা তার নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েন। পাঁচজন প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়তুন ৩ হাজার ৫১৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন।

জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর জয়তুন পূর্ণশক্তি, সাহস ও দক্ষতা নিয়ে তার নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোর কাজ শুরু করেন। কর্মশালা ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তিনি তৃণমূলের নারীদেরকে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে থাকেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস, জাতীয় কন্যাশিশু দিবস, মানবাধিকার দিবস, বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জয়তুনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের প্রভাব পড়ে পুরো এলাকায়।

বর্তমানে তিনি এলাকার গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা ও সাধারণ রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে ভূমিকা পালন করছেন। নিশ্চিত করছেন মা ও শিশুর টিকাদান। তার প্রচেষ্টায় এলাকায় কমে এসেছে গর্ভবতী নারী ও শিশুর মৃত্যু। জয়তুন-এর নেতৃত্বে ওয়ার্ড অ্যাকশন টিমের সভা, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা বিষয়ক উঠান বৈঠক, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বিরোধী প্রচারাভিযান, স্যানিটেশন ও বৃক্ষরোপণ বিষয়ক প্রচারাভিযান পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযান এলাকার মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করছে।

সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে আরও এগিয়ে নেয়ার জন্য জয়তুন যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সাথে। তিনি বর্তমানে এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সভাপতি, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি।

এছাড়া তিনি ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কমিটির সদস্য পদে থেকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

ব্যক্তিগত জীবনেও জয়তুন একজন সফল মানুষ। বিভিন্ন সংস্থায় তার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সঞ্চয় রয়েছে। তার নিজের একটি টমটম গাড়ি রয়েছে, যার বাজার মূল্য ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। তার বড় ছেলে আবুল খায়ের এই টমটম চালিয়ে প্রতিদিন আট থেকে নয় শ' টাকা জয়তুনের হাতে জমা দেয়। ২০১৫ সালে জয়তুন নিজ বাড়িতে ২৬ হাত লম্বা ও ৯ হাত প্রশস্ত একটি ঘর নির্মাণ করেছেন এবং ঘরে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়েছেন।

সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে চলমান রাখার জন্য তিনি আগামীতে পুনরায় ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান। তিনি চান, এলাকায় ছোট ছোট নারী সংগঠন গড়ে তুলতে, যাতে নারীরা সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গড়ে তুলতে পারে এবং আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে। এছাড়া তিনি নিজ ইউনিয়নকে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও পারিবারিক নির্যাতনমুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চান। এসব পরিকল্পনা পূরণের লক্ষ্যেই জয়তুন সদা সক্রিয় রয়েছেন।

"সকলকে গিয়া বলো- ওঠো, জাগো, আর ঘুমিও না।
সকল অভাব, সকল দুঃখ ঘুচাবার শক্তি
তোমাদের নিজের ভিতরে রয়েছে- এই কথা বিশ্বাস করো
তাহলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে"।

-স্বামী বিবেকানন্দ

নারী-পুরুষ সম-মর্যাদার সমাজ গড়তে চান সুপ্রিয়া চক্রবর্তী

এস.এ হামিদ

প্রাকৃতিক সম্পদের ভরপুর, অপূর্ব সুন্দর, বিভিন্ন প্রজাতির লাখো লাখো পাখির কোলাহল, মন কেড়ে নেয়া লাল পদ্মফুল, শত প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের অভয়াশ্রম হাইল হাওরের প্রাণকেন্দ্র 'বাইক্কা বিল'। এটি জাতীয় পর্যায়ের এক অভয়াশ্রম। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার কালাপুর ইউনিয়নের হাজীপুর ও বরুনা গ্রামের পাশেই এই বাইক্কা বিল। প্রতিদিন হাজারো মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং মনে আনন্দের খোরাক জোগায় বাইক্কা বিলের পাখি, বিলুপ্ত প্রায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ। নিরাপদেই এখানে এসব প্রজাতির বংশ বিস্তার হচ্ছে। এতে উপকৃত হচ্ছে দেশ ও জাতি। স্থানীয় জনগণের শতকরা ৮০ ভাগেরই বেঁচে থাকার একমাত্র সম্পদ হাইল হাওর। এখানকার মানুষ প্রভাবশালী মহলের নানা কূটকৌশল ও অন্যায় মোকাবিলা করে এবং সংগঠিত হয়ে দরিদ্রতা, কুসংস্কার, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

বাইক্কা বিলের পাশেই অবস্থিত বরুনা গ্রামে ১৯৭২ সালের ১ জুলাই দরিদ্র এক পূঁজারী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সুপ্রিয়া চক্রবর্তী। বাবা মৃত কোকিল চন্দ্র চক্রবর্তী, আর মা মৃত উষা দেবী চক্রবর্তী। তিন বোনের মধ্যে সুপ্রিয়া সবার ছোট। সুপ্রিয়ার বয়স যখন দু বছর তখন ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে তাহার স্নেহময়ী মা মারা যান। তখন বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করেন কুমিল্লা জেলায়।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষে সুপ্রিয়া ভর্তি হন বাড়ি থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে স্থানীয় ভৈরবগঞ্জ দ্বি-পাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়ে। পরিবারের দরিদ্রতা ও কুসংস্কারের কারণে ১৯৮৬ সালে নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৮৭ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে জীবনের পূর্ণ মানে বুঝে ওঠার আগেই সুপ্রিয়াকে বিবাহ দেয়া হয় হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার আমরাখাই গ্রামের অরুণ চক্রবর্তীর সাথে। অরুণ পেশায় পূজারী ব্রাহ্মণ এবং পেশায় ছিলেন ব্যবসায়ী। কিন্তু স্বামীর আয়-রোজগার ছিল কম থাকায় অভাব-অনটনের মধ্যেই সুপ্রিয়ার দিন কাটতে থাকে। সংসারে এরই মধ্যে আসে একে একে পাঁচ সন্তান (তিন ছেলে এবং দু মেয়ে)। প্রথম সন্তান রিতা চক্রবর্তী তিন মাস বয়সে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেজাজের, ভূত ও প্রেত ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। যারফলে কবিরাজী চিকিৎসা, তাবিজ, আর ঝাড়ফুঁক দিয়েই চলে মেয়ের চিকিৎসা। ভাল চিকিৎসা না হওয়ায় অকালেই মারা যায় তিন মাসের শিশু রিতা চক্রবর্তী। অবশ্য সে সময় উন্নত চিকিৎসার সুযোগ কম ছিল। সুপ্রিয়া মনে প্রচণ্ড আঘাত পান, ভাবতে থাকেন যেভাবেই হোক সমাজের কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি দূর করতে হবে এবং মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

সুপ্রিয়া সবসময় চিন্তা করতেন, কী করে লেখাপড়া শিখিয়ে সন্তানদের মানুষের মত মানুষ করা যায়। একদিন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নবীগঞ্জ ছেড়ে বাবার বাড়ি শ্রীমঙ্গল উপজেলার বরুনাতে ফিরে আসেন। আশ্রয় নেন কাঁচামাটির একটি কুঁড়ে ঘরে। তার এ ধরনের আচমকা আগমনকে সুপ্রিয়ার সৎমা ও কাকতো ভাইয়েরা কেউই ভালো চোখে দেখেনি। কারণ সুপ্রিয়ার মায়ের ১০ শতক বাড়ির জায়গা দখলে রেখে তারা ব্যবহার করছিল। অথচ হিন্দু আইন ও সামাজিক রীতি অনুযায়ী একমাত্র সুপ্রিয়াই এসব জমির মালিক। এমতাবস্থায় সুপ্রিয়ার চোখের পানি ফোঁটা ফোঁটা হয়ে বাড়ির পাশের শাওনছড়া খালের পানির সাথে মিশে বাইক্কা বিলে যায়। ভাবতে থাকেন কী করবেন? তেমন লেখাপড়া নেই, অর্থ-সম্পদ নেই। শুধুমাত্র দৃঢ় মনোবল, সততা, বিশ্বাস ও ইচ্ছেশক্তি নিয়ে এগিয়ে যান সুপ্রিয়া।

এ সময় তিনি একটি আয়মুখী কাজ খুঁজতে থাকেন। একটি কাজ পেয়েও যান তিনি। ২০০৭ সালে শ্রীমঙ্গল উপজেলায় একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় স্বাস্থ্যকর্মী পদে কাজ শুরু করেন সুপ্রিয়া। প্রায় আট বছর সততা ও নিষ্ঠার সাথে তিনি এই চাকরি করেন। পাশাপাশি এলাকার শিশুদের প্রাইভেট পড়ানো এবং গান শিখানোর মাধ্যমে যে আয় হয় তা দিয়েই সন্তানদের লেখাপড়া ও সংসারের অন্যান্য খরচ যোগান দিতে থাকেন সুপ্রিয়া।

তিনি ২০১২ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১,৬৩০তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পর মৌলভীবাজারে অনুষ্ঠিত বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত চার দিনব্যাপী 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণ দুটি সুপ্রিয়ার সকল প্রকার হতাশাকে দূর করে দেয় এবং তার মধ্যে জাগ্রত করে আত্মবিশ্বাস। তিনি বিদ্যমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পান। ধারণা লাভ করেন সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কেও। প্রশিক্ষণের পর তিনি সমাজ পরিবর্তনের সাহসী পরিকল্পনা নেন, ঠিক যেমন বাইক্কা বিলে ডুবে থাকার পর ভেসে উঠা নৌকায় যাত্রা করার মতো।

সুপ্রিয়া বুঝতে পারেন, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে হলে নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে এবং নারীদেরকেই সমাজ উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ নারীরাই ক্ষুধামুক্তির প্রধান চাবিকাঠি।

বড় পরিসরে সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালে সুপ্রিয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত মহিলা আসনে প্রার্থী হন। স্থানীয় জনগণের ভালবাসা ও সমর্থন নিয়ে তিনি ২ হাজার ৮৩৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর সুপ্রিয়া নিজেকে পুরোপুরি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত করেন। কর্মশালা ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তিনি নারীদের অধিকার, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ আইন ইত্যাদি সম্পর্কে তৃণমূলের নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। সুপ্রিয়া আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-সহ বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি মানুষকে মানবাধিকার, নারী ও কন্যাশিশুদের অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলছেন।

সুপ্রিয়ার উদ্যোগে পরিচালিত উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযানের ফলে তার এলাকায় ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ কমেছে ৯৯ শতাংশ। গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা ও নবজাতকের মৃত্যুর হার কমেছে। এখন সকল গর্ভবতী নারী নিরাপদ প্রসবের জন্য সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে যান। স্থানীয় নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে তথা মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি সেলাই প্রশিক্ষণ, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নারী তাদের কর্মসংস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

সুপ্রিয়া ও স্থানীয় স্বেচ্ছাব্রতীদের যৌথ উদ্যোগের ফলে হাওর পাড়ের হাজিপুর, বরুনা ও নয়নশ্রী গ্রামে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। মানুষের মধ্যে বেড়েছেন সচেতনতা, দূর হচ্ছে কুসংস্কার।

সুপ্রিয়া তার সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ভবিষ্যতে পুনরায় ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান। তিনি চান এমন একটি সমাজ, যেখানে সবার বিশেষ করে নারী-পুরুষের সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

> "ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন-অগ্রসর হউন! বুক ঠেলিয়া বল মা, আমরা পশু নই। বল ভগিনী, আমরা আসবাব নই; বল কন্যে, আমরা জড়াই অলংকার-রুপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ।
>
> -বেগম রোকেয়া

আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীক পাটিচরার রেহেনা বেগম

মো. রবিউল ইসলাম

বাংলাদেশের নারীরা এখন পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রায় প্রতিটি খাতেই অবদান রেখে চলেছেন। কর্পোরেট অফিস, কিংবা বেসরকারি উন্নয়ন–সব জায়গায় নারীর ক্ষমতায়নের ইতিবাচক চিত্র পরিলক্ষিত হয়। তবে বিভাগীয় শহরগুলোয় নারীর অবস্থানের উন্নয়ন ঘটলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর অবস্থার এখনও আশানুরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার দিক থেকে গ্রামীণ নারীরা এখনও অনেক পিছিয়ে। বেশিরভাগ গৃহিণীই স্বামীর আয়ের ওপর নির্ভরশীল। তবে কিছু কিছু নারী সরকার ও এনজিও'র পৃষ্ঠপোষকতায় হস্তশিল্প, কৃষি ও সেলাই ইত্যাদির মাধ্যমে নিজ নিজ পরিবারে অবদান রেখে চেলেছেন। অনেক নারী এখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদ অলঙ্কৃত করে রেখেছেন। এতে মনে হতে পারে সমাজে ঘটেছে নারীর অবস্থানের বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু সার্বিক বিচারে এখনও একে বড় ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসেবে নেয়া যায় না। আর যে সমস্ত নারী ইতোমধ্যে নিজেদের কর্ম-প্রচেষ্টায় নিজেকে সমাজে

অন্যতম অংশীদারে পরিণত করেছেন তাদেরই একজন রেহেনা বেগম।

নওগাঁ জেলা সদর থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে পত্নীতলা উপজেলার অবস্থান। উপজেলা সদর হতে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে পাটিচরা ইউনিয়নের আমিনাবাদ গ্রাম। এ গ্রামেরই সংগ্রামী নারী রেহেনা বেগম। অভাব আর অপুষ্টি নিয়ে ১৯৭২ সালে মহাদেবপুর উপজেলার কালনা বিশুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। রেহেনার বাবা আয়েজ উদ্দীন মন্ডল কৃষিকাজ করে সংসার পরিচালনা করেন। মা আমিরন বিবির ঘরের কাজ সামলে নিয়ে যতোটা পারেন স্বামীকে সহায়তা করেন। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয় রেহেনা। নির্মল গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকেন রেহেনা। শিক্ষাজীবন শুরু হয় স্থানীয় কালনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এ বিদ্যালয় থেকেই তিনি কৃতিত্বের সাথে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করেন। সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৮৬ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে আমিনাবাদ গ্রামের ছামছুল আলমের সাথে রেহেনার বিয়ে হয়। ছামছুল আলম পেশায় একজন গ্রাম পুলিশ। স্বামীর সংসারে এসে শ্বশুর-শ্বাশুড়ি এবং ননদ-দেবরদের সাথে ভালোই মানিয়ে নিয়েছিলেন রেহেনা। এছাড়া অল্প দিনের মধ্যে স্বামীর বন্ধু হয়ে উঠেন তিনি। এভাবে তিন বছর বেশ আনন্দেই তাদের দিন চলে যায়। বিয়ের পাঁচ বছর পর তাদের প্রথম সন্তানের আগমন ঘটে। স্বামীর সামান্য আয়ে সন্তানকে লালন-পালন করা কঠিন হয়ে উঠে। এতে পরিবারের অন্যদের চোখে রেহেনা এবং ছামছুল পরগাছার মত হয়ে উঠেন। উপায় না পেয়ে আলাদাভাবে সংসার পাততে হলো তাদের।

এই প্রথম আলাদা হাড়িতে ভাত খেতে হলো রেহেনাকে। প্রবল আকাঙ্ক্ষা যার ভেতরে, তাকে কী আর দমিয়ে রাখা যায়। অভাব থাকলেও আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল না তাদের নতুন সংসারে। স্বামী প্রায়শই রেহেনাকে বিভিন্ন চিঠির ঠিকানা পড়তে বলতেন, এর মাধ্যমে রেহেনা স্বামীকে স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার উদ্যোগ নেন। ছেলেকে নাগোরগোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। রেহেনা মাঝে মধ্যে সন্তানের খোঁজ নিতে বিদ্যালয়ে যান, এর ফলে অনেক অভিভাবকের সাথে পরিচয় ঘটে এবং অনেকের সাথে নিজেদের দুঃখ দুর্দশার কথা বর্ণনা করেন। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত দেন। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয়ে ওঠে না। বাড়িতে হাঁস-মুরগি আর ছাগল পালন করে অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা হলেও পাল্টানোর চেষ্টা করেন।

২০০৮ সালে রেহেনা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১,৪০৭তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণটি বিশেষ করে আত্মশক্তি বৃদ্ধির আলোচনাটি রেহেনাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। নতুন পথের দিশা পান তিনি। বাড়ি ফিরে গিয়ে আত্মমুক্তির জন্য প্রতিটি পাড়ায় শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনে প্রচারাভিযান এবং বিভিন্ন বিষয়ে উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন। সম্পৃক্ততা ঘটে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে। এমতাবস্থায় নিজের গ্রামে ৬৭টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং নয়টি হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপনে ক্যাটালিস্টের দায়িত্ব পালন করেন রেহেনা।

মানুষের সাথে মেশার সুবাদে গ্রামের দুঃস্থ নারীরা রেহেনার কাছে বিভিন্ন কাজের আবদার নিয়ে আসে। রেহেনা ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয়ভাবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সাথে আলোচনা করে ৩৫ জন নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন। স্বামীর সাথে আলোচনা করে দুটি ছাগল বিক্রি করে তিনি নিজেও সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। তার দেখাদেখি রত্না, সাঈদা, শামশুন্নাহার, জোসনা, জান্নাতুন, রোকেয়া, বিজলী রাণী এবং মালতি রাণীও সেলাই মেশিন ক্রয় করেন এবং কাপড় সেলাই করে বর্তমানে আয় করছেন।

২০১২ সালে আলোহা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৮৭তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন রেহেনা। তিন দিনের প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে এলাকায় ফিরে যান তিনি। এলাকায় ফিরেই শুরু করেন নারীদের সংগঠিত করার কাজ। গ্রামের ২৫ জন নারীকে নিয়ে গড়ে তোলেন সমবায় সমিতি। নিজে সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। বর্তমানে সমিতিতে ৮০ হাজার টাকা মূলধন জমা আছে। ২০১৩ সালে সরকারি এফএলএস প্রকল্প চালু হলে সমিতির নতুন নামকরণ করা 'আমিনাবাদ গ্রাম সমিতি'। এখানেও সভাপতি নির্বাচিত হন রেহেনা। তিনি সমিতির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ২৭ জন নারীকে নিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ তৈরি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেন, যাদের মধ্যে ছয়জন নারী বর্তমানে ব্যাগ তৈরি ও বাজারজাত করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সংগঠন গড়ে তোলার পাশাপাশি রেহেনা এলাকার নারীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলছেন। বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক বন্ধ করা, শিশুদের জন্মনিবন্ধন, শিশুর টিকা নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহ যোগান তিনি। রেহেনা এ পর্যন্ত ১৮ জন

শিশুর জন্মনিবন্ধন, ২২ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ১৭ জন গর্ভবতী নারীকে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করেছেন এবং ২২ জন নারী ও ১৭ জন পুরুষকে (বয়স্ক) শিক্ষার আলো দেখিয়েছেন। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে নিয়মিত নারীদের সাথে ইস্যুভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ যোগান তিনি।

এলাকার নারী-পুরুষদের বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ নিতে ব্যাংক ঋণের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকে যোগাযোগ করিয়ে দেন রেহেনা। ইসলামী ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, কর্ম-সংস্থান ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ পত্নীতলার বিভিন্ন ব্যাংক হতে এ পর্যন্ত তিনি ৩৭ জন উদ্যোক্তাকে কৃষি এবং এসএমই ঋণ পাইয়ে দিয়েছেন। রেহেনার যেসব কাজে সহায়তা দরকার সেসব ক্ষেত্রে উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মরিয়ম বেগম শেফা এবং স্থানীয় পর্যায়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করছে।

পাটিচরা ইউনিয়ন পরিষদ রেহেনার ইতিবাচক কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ইউনিয়ন পরিষদের 'শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক' স্থায়ী কমিটির সদস্য করে। নাগোরগোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছেন রেহেনা। এছাড়াও ২০১৩ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' কার্যক্রমে পত্নীতলা উপজেলার সেরা জয়িতাদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন তিনি।

রেহেনা বলেন, 'একা ভালোভাবে বেঁচে থাকার নাম বেঁচে থাকা নয়, এলাকার মানুষকে নিয়ে একসাথে সুখে-দুঃখে চলাই সত্যিকার অর্থে বেঁচে থাকা। সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে মানুষকে এগিয়ে নিতে হবে। আর পরনির্ভরতা আমাদের শত্রু, তাকে দমন করে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। এজন্যই আমি সবাইকে আহ্বান জানাই, আসুন প্রথমে নিজেকে জয় করি।'

রেহেনা নিজের ছেলেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করানোর পর ঢাকার বাংলা কলেজে অনার্সে ভর্তি করিয়েছেন। স্বামীর মাসিক আয় ২ হাজার ১০০ টাকা আয় করেন। আর রেহেনা নিজে সেলাই মেশিনের কাজ এবং হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন করে মাসে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা আয় করেন। দু জনের আয় এবং সামান্য যা জমি আছে তা দিয়ে তাদের সংসার ভালভাবেই চলে যাচ্ছে।

অসুস্থ শ্বাশুড়ির দেখাশুনা করে এলাকায় ভাল বউয়ের খেতাব পেয়েছেন রেহেনা বেগম। যে ননদ-দেবররা এক সময় রেহেনাকে অবজ্ঞা করেছে এখন রেহেনা তাদের আস্থা এবং ভরসার স্থান। নিরবে রেহেনার প্রতিটি পদচারণা আমিনাবাদ গ্রামকে এগিয়ে নিচ্ছে। একজন নারীর হাত ধরেই একটি এলাকা কীভাবে এগিয়ে যেতে পারে তা রেহেনাকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ পেয়ে তৃণমূলে অনেকটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন রেহেনা। রেহেনা বেগমের মতো নারীনেত্রীদের হাত ধরেই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ-এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ সফলতা অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে স্থানীয় নারীদের নিকট তিনি অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত হয়েছেন। রেহেনার দেখানো পথ সমাজের অসহায় নারীদের আশার আলো যেখাচ্ছে, পাশাপাশি তার মত ব্যক্তি উদ্যোগের ছোট ছোট কাজগুলোই দেশের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করছে।

সালমা এখন পথের দিশারী

হারুনুর রশিদ

সমাজে বেশিরভাগ মানুষই জীবন চলার পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে কিংবা পরাজিত হলে অন্যের কাঁধে দায়ভার চাঁপিয়ে দিতে চান। কিন্তু যারা সুখ-দুঃখ আর বাঁধা বিপত্তির তোয়াক্কা না করে অর্থপূর্ণ জীবনের লক্ষ্যে অবিচল থেকে পথ চলেন, তারাই তো হন অসাধারণ জীবনের অধিকারী। অন্যরা তাকে দেখে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পায়। এমনই অনুপ্রেরণা উৎস এবং প্রাণসঞ্চারী মানুষ সালমা বেগম। যিনি জীবনের শুরুতে বাধাগ্রস্ত হয়ে থেমে যাননি, জয় করেছেন সকল প্রতিকূলতাকে।

পত্নীতলা উপজেলার আকবরপুর ইউনিয়নের চক মহেষ গ্রামে সালমার জন্ম হয় ১৯৬৫ সালে। বাবা আফসার আলী এবং মা জোসনা বেগমের স্নেহমাখা বড় সন্তান তিনি। ছেলেবেলায় পাড়ার অন্য মেয়েদের মতো তিনি নির্বিঘ্নে পথ চলতে শুরু করেন। জীবনের শুরুতেই দু বছর বয়সেই মাকে হারিয়ে এতিম হতে হয় সালমাকে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পরিবারের একমাত্র অবলম্বন বাবাকেও হারাতে হয়। দু সন্তানকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন সালমার মা। এমতাবস্থায় কী করণীয় তা ভাবতে ভাবতে কেটে যায় আরও একটি বছর। অভিভাবক হারা মেয়ে দুটি চাচা আনছার আলীর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হতে থাকে।

পাশের গোয়ালগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার সুযোগ পান সালমা। চাচার সংসারে থাকা খাওয়া, তাই মেয়ে বড় হচ্ছে দেখে চাচা-চাচীর মাথাব্যাথা শুরু হয়। গ্রামের এক তরুণ সাজ্জাদের সঙ্গে তাই ১৪ বছর বয়সেই বিয়ে দেয়া হয় সালমাকে। শুরু হয় অভাবী ললনার সংসার সংগ্রাম। বিবাহিত জীবনে সালমা বর্তমানে দু সন্তানের জননী। নানা অভাব-অনটন আর দারিদ্র্যের কষাঘাতে কাটতে থাকে সালমার সংসার।

এমতাবস্থায় ২০০৮ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সিদ্দিক আলীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সালমা আকবরপুর ইউনিয়ন পরিষদে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১,৩৮২তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের প্রতিটি বিষয় যেন তার জীবন থেকে নেয়া ঘটনা। তাই তিনি চারদিনের প্রতিটি আলোচনায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের আলোচনা তাকে নতুন পথের দিশা দেয়। মনের অজান্তে তিনি আত্মনির্ভরশীলতার অনুশীলন শুরু করেন। প্রশিক্ষণ থেকে বাড়ি ফিরেছেন ঠিকই, কিন্তু মন পড়ে আছে আলোচনার মধ্যে। চিন্তিত দেখে স্বামী কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে তাকে সব কথা খুলে বলেন। একজন থেকে এখন দু জনে খুঁজতে থাকেন স্বনির্ভরতার পথ। এর মধ্যে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বাড়ি ফিরে এসে সময়ক্ষেপণ না করে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দুটি ছাগল বিক্রি করে সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। প্রথমে নিজের পরিবারের চাহিদা মেটান, এর পাশাপাশি এলাকার নারী ও শিশুদের জামা-কাপড় সেলাই করে তার কিছু টাকা আয় হয়। হাতে অর্থ আসায় নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে পান। শুরু করেন বাড়িতে কাপড় এনে বিক্রি এবং সেলাইয়ের কাজ। মাত্র দু মাসের মধ্যে সালমার সফলতার সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সালমা সেলাইয়ের কাজের পাশাপাশি নারীদের সংগঠিত করে সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন। তার সমিতির ২৬ জন সদস্য সপ্তাহে দশ টাকা করে সঞ্চয় করতে থাকে। সদস্যরা সালমাকে সমিতির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে। বর্তমানে সমিতির মূলধন ৮৬ হাজার ৮৯০ টাকা। সমিতির সঞ্চয় থেকে সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হয়। ছয় মাস পর পর সমিতির হিসাব করা হয়। এছাড়া সালমা

নারীদের আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে না দেয়া, পুষ্টি, নারী শিক্ষা, পরিবারে নারীদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে অভিভাবকদের সাথে সভা-সহ নানান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সালমার গঠনমূলক কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ তাকে পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচিত করে।

সালমা নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'ঘরের কোণে যেমন কুনো ব্যাঙ থাকে, আমিও তেমনি ছিলাম। নিজের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি এখন শুধু নিজেকে নয়, সমাজকে এগিয়ে নিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

আজকের প্রতিশ্রুতিশীল সালমা নারীনেত্রী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন দৃষ্টান্ত হিসেবে। কাজ করে সফল সালমার পথচলা অন্য নারীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। তৃণমূলের নারীনেত্রী সালমারা জয়যুক্ত হোক, নারীর পথচলা সুগম হোক– এটা সবার প্রত্যাশা।

অসহায় নারীদের অনুপ্রেরণার উৎস টুম্পা রাণী বিথীকা

মো. গিয়াস উদ্দীন

পৃথিবীর অন্যতম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, তারই কোল ঘেঁষে অবস্থিত দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলা সাতক্ষীরা। এই জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের নেংগী গ্রামের এক হিন্দু পরিবারে বসবাস টুম্পা রাণীর। টুম্পাদের বাড়ি গ্রামের দক্ষিণ পাশে। গ্রামের সবাই আদর করে তাকে বিথীকা নামে ডাকে।

বিথীকা জন্মগ্রহণ করেন শ্যামনগর উপজেলার কাশিমাড়ী ইউনিয়নে ১৯৯২ সালে। বাবার নাম কালিপদ সরকার, আর মায়ের নাম সুষমা রাণী। চার ভাই ও দু বোনের সংসারে বিথীকা বাবা-মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। জন্মের পর বাবা-মা মেয়েকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে যান। কারণ বিথীকার গায়ের রং ছিল একটু কালো বর্ণের। দেখতে কালো হলেও বিথীকা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং বুদ্ধিমতী। বিভিন্ন কাজে তিনি ছিলেন পারদর্শী এবং কাজ করার ব্যাপারে তার ছিল বিপুল আগ্রহ।

বিথীকার বাবার সংসার চলতো স্থানীয় কাশিমাড়ী বাজারে ছোট্ট একটা মুদির

দোকান আর এক বিঘা জমিতে হাল-চাষ করে। অভাব-অনটনের মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠেছিলেন বিথীকা। তার বয়স যখন সাত বছর তখন বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়ার জন্য তিনি বাবাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মেয়েদেরকে অত লেখাপড়া করানোর দরকার নেই এবং কয়েক বছর পরেই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে– এ অজুহাতে তার বাবা তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু যখন অন্য খেলার সাথীরা স্কুলে যায়, আর সে স্কুলে যেতে পারে না– এটা বিথীকা কোনোমতেই মেনে নিতে পারেন না। প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে অসহ্য মনে হয়। বাবাকে অনেক অনুরোধের পর বিথীকাকে স্থানীয় কাশিমাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়া হয়। এরপর প্রত্যেক শ্রেণিতে বিথীকা ভালো ফলাফল করে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে।

দিনে দিনে বিথীকা বড় হতে থাকে। হঠাৎ একদিন বিথীকার জীবনে নেমে আসে এক দুঃসংবাদ। পৃথিবীর মায়া ছেড়ে তার মা চলে যান না ফেরার দেশে। ছোট্ট বয়সে মাকে হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন বিথীকা। বিথীকার মায়ের মৃত্যুর চার মাস পরেই তার বাবা আবার বিয়ে করেন। এমনিতেই অভাবের সংসার, তার উপর আবার সৎ মায়ের নির্যাতন – বিথীকা মানসিকভাবে আরও ভেঙে পড়েন। ভাই-বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে বিথীকাকে মাঝে মধ্যেই আহার যোগাতে অন্যের জমিতে কাজ করতে যেতে হত। এভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করে বিথীকা তার দিন অতিবাহিত করতে থাকেন।

অষ্টম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় বিথীকাকে বিয়ে দেয়ার জন্য তার বাবা মরিয়া হয়ে উঠেন। নানাভাবে বোঝানোর পরও বাবা মেয়েকে বিয়ে দিতে অটল থাকেন। অবশেষে কালিগঞ্জ উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের নেংগী গ্রামের অমল তরফদার-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন বিথীকা। বিয়ের সময় বিথীকার বাবাকে যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে হয়। বিয়ের পর তাকে আর অভাবের সম্মুখীন হতে হবে না– এমন আশা নিয়ে স্বামীর সংসারে আসেন তিনি। কিন্তু স্বামীর সংসারেও এসে দেখেন সেই অভাবের দানব। তার স্বামী ছিলেন একজন বেকার, অকর্মণ্য এবং অলস প্রকৃতির ছেলে। স্বামীর নিজস্ব কোনো আয় রোজগার না থাকায় স্বামীর সংসারে শ্বশুর-শ্বাশুড়ির কাছ থেকে বিথীকাকে নানান ধরনের কটূ কথা শুনতে হতো। এভাবেই বিথীকার সংসার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে।

বিয়ের বছর দেড়েক পর বিথীকার কোলজুড়ে আসে ফুটফুটে কন্যা সন্তান। সন্তানের আনন্দে বিথীকা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন, পাশাপাশি সংসারের অসচ্ছলতার জন্য মনের মধ্যে গভীর কষ্টও অনুভব করেন। কোনো উপার্জন না থাকায় শ্বশুরের সংসার থেকে তার স্বামীকে আলাদা করে দেয়া হয়। একদিকে স্বামীর কোনো রোজগার নেই, অন্যদিকে ছোট সন্তান এবং সংসারের বোঝা–সব মিলিয়ে চোখে অন্ধকার দেখেন বিথীকা। কীভাবে সংসার চলবে সেই চিন্তায় তিনি আরও অস্থির হয়ে ওঠেন।

ছবি: কাপড় সেলাই করছেন টুম্পা রাণী বিথীকা

এত কষ্টের মধ্যে সব সামলে নিয়ে বিথীকা স্বামীর সংসারে থেকে এসএসসি পাশ করেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নানান সাংসারিক জটিলতা এবং স্বামীর অনুমতি না থাকায় বিথীকা আর লেখাপড়া করতে পারেননি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। বিয়ের চার বছর পর তার স্বামীও একদিন পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যান। মেয়েকে নিয়ে বিথীকা এখন কী করবেন, কী খাবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তা মধ্যে পড়ে যান। শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠা সেই দুরন্ত, ডানপিটে এবং প্রতিবাদী বিথীকা আবারও হতাশার সাগরে ডুবে যান। কিন্তু না, শোককে শক্তিতে পরিণত করেন তিনি। স্বামী মারা যাওয়ার কিছুদিন পর স্থানীয় একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পান বিথীকা।

একদিন হঠাৎ করেই বিথীকা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক

একটি প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করেন। প্রচারাভিযানে আলাপ হয় উক্ত সংস্থার সাতক্ষীরা জেলার সমন্বয়কারী মোঃ গিয়াস উদ্দীনের (বর্তমান লেখক) সাথে। তার মুখ থেকে হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ জানতে পারেন এবং এর মধ্য থেকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আগহ প্রকাশ করেন বিথীকা। অতঃপর ২০১২ সালে কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১,৫৪৫তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন তিনি। প্রশিক্ষণটি তার অসহায় মনে সাহস যোগায় এবং জীবন সংগ্রামে একাই পথ চলতে শেখার অনুপ্রেরণা যোগায়। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের পর বিথীকা নিজেকে অসহায় ভাবা, গরীব বলে নিজেকে গুটিয়ে রাখা, নিজের দরিদ্র অবস্থার জন্য ভাগ্যকে দোষারোপ করা– এ বৃত্ত থেকে বেরুনোর প্রেরণা খুঁজে পান।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণের কিছুদিন পর বিথীকা সাতক্ষীরা পিটিআরসি-তে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি নারীর অধিকার ও জেন্ডার বৈষম্য ইতাদি বিষয়ে জানতে পারেন।

প্রশিক্ষণ দুটি গ্রহণের পর বিথীকা নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলার পরিকল্পনা নেন। তিনি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত সেলাই প্রশিক্ষণ, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ, কারচুপি ও গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর আর বিথীকাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সেলাই প্রশিক্ষণের পর তিনি স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন এবং নিজ বাড়িতেই কাপড় সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। এ কাজ করে তিনি মাসে প্রায় দু তিন হাজার টাকা করতে থাকেন। বিথীকা এখন তিনটি সেলাই মেশিন কিনে বাড়িতেই একটি মিনি গার্মেন্টস দিয়েছেন, যেখান থেকে তার প্রতিমাসে প্রায় সাত হাজার টাকা আয় হয়।

তিনি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত সেলাই, ব্লক-বাটিক এবং কারচুপি-সহ প্রায় বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। এসব কাজের পাশাপাশি তিনি ২০১৩ সালে নিজ বাড়িতে প্রায় একশ হাঁস-মুরগির একটি খামার গড়ে তোলেন। হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে মাংস এবং ডিমের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি দুধ ডিম বিক্রি করে সংসারের আয় বৃদ্ধি করছেন। বাড়ির চারপাশে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষের মাধ্যমে বিথীকা প্রতিমাসে প্রায় দুই হাজার টাকা আয় করেন। এছাড়া তিনি তার সঞ্চয় দিয়ে দুটি গরু ক্রয় করেছেন। গরুর দুধ বিক্রি করে প্রতিদিন প্রায় দু শ' টাকা আয় করেন।

বিথীকা এখন শুধু তার নিজেকে নিয়েই নয়, অন্য মেয়েদের কথাও ভাবেন। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বিথীকা তার নিজের পরিবর্তনের গল্প শোনান এবং অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উৎসাহ যোগান। তিনি নিয়মিতভাবে ওয়ার্ড অ্যাকশন টিম ও নারীনেত্রীদের সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিথীকা নিয়মিতভাবে গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে আশপাশের দুই তিন গ্রামে নিয়মিত উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন।

ছবি: বাড়ির পাশের জমিতে সবজি চাষ করছেন টুম্পা রাণী বিথীকা

তিনি ২০১৪ সালে ২৫ জন নারীর সমন্বয়ে 'প্রতিভা নারী উন্নয়ন সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সমিতির সদস্যরা প্রত্যেকে সাপ্তাহিক দশ টাকা হারে সঞ্চয় শুরু করেন এবং বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা। সঞ্চয়ের পাশাপাশি সমিতির মাসিক সভাগুলোতে তারা বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ও স্যানিটেশনের মত সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সমিতির সদস্যরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, তারা তাদের গ্রামে কোনো বাল্যবিবাহ হতে দিবেন

না। এ লক্ষ্যে তারা গ্রামের অভিভাবকদের সচেতন করে থাকেন।

বিথীকা নিজে বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি। তাই লেখাপড়ার গুরুত্ব বোঝেন। তাই শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে বিথীকা একটি স্কুল গড়ে তুলেছেন, যেখানে তিনি নিজেই বিনামূল্যে দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করান।

বিথীকা বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম ও সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর সদস্য। তার সাফল্যে স্থানীয় অনেক নারীই আজ উজ্জীবিত। তাদের কাছে বিথীকা অনুপ্রেরণার উৎস। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে তিনি আজ পরিপূর্ণ। বিথীকা জানান, সমাজের উন্নয়নে, ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ নির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে তিনি সদা কাজ করে যাবেন।

লীলা রাণী দাসঃ হার না মানা এক নারী

মনিরুজ্জামান

লীলা রাণী দাস, জীবনযুদ্ধে হার না মানা এক নারীনেত্রী। সংগ্রামী এই নারীর জন্ম ১৯৬৯ সালে বাগেরহাট জেলার ষাটগুম্বজ ইউনিয়নের বাদোখালী গ্রামে। বাবার নাম কালী পদ দাস, যিনি একজন সচ্ছল গৃহস্থ। পাঁচ ভাই-বোনের সংসারে লীলা তৃতীয়। ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে হেসে-খেলেই তার শৈশবের সময়গুলো পার করেন তিনি।

ছবি: নারীদের অধিকার সচেতন করে তুলছেন লীলা রাণী দাস (মধ্যখানে, জামদানি রংয়ের শাড়ি পরা)

লীলা তার ছয় বছর বয়সে নিজ গ্রাম বাদোখালীর পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে এসএসসি পাশ করেন রহিমাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে। এরপর আর লেখাপড়া হয়নি লীলা রাণী দাসের। তার একটা বড় কারণ ছিলো ১৯৮৪ সালে তার বিয়ে হয়ে যাওয়া। স্বামী তদানীন্তন বাংলাদেশ রাইফেল্‌স-এর সিগন্যাল অপারেটর চৈতন্য কুমার দাস। নিবাস নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার পাটনা গ্রামে। বিয়ের পর লীলা রাণী দাস শ্বশুরালয়ে চলে আসেন। আর দশটা বিবাহিত নারীর মত সুখেই কাটতে থাকে তার দিন।

দেখতে দেখতে লীলার ঘর আলো করে পরপর জন্ম নেয় দু পুত্র সন্তান। বড়

ছেলে সোহাগ দাস, ছোট ছেলে চয়ন দাস। লীলা ও তার স্বামী চৈতন্য দাসের বড় ইচ্ছে ছেলে দুটোকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। চৈতন্য দাস ছুটিতে বাড়ি এসেছেন। খাগড়াছড়ি থেকে এবার ঢাকা হেড কোয়ার্টারে বদলি হয়ে আসবেন। স্ত্রী এবং ছেলে দুটোকে নিয়ে যাবেন ঢাকায়। সেখানে ভাড়া করা বাসায় থাকবেন। ছেলে দুটোকে ভালো স্কুলে পড়াবেন। অনেক স্বপ্ন ও আশা বুকে নিয়ে ছুটি শেষে খাগড়াছড়ি ফিরে গেলেন লীলার স্বামী চৈতন্য দাস।

১৯৯১ সালের ১১ই ডিসেম্বর। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খবর এলো চৈতন্য দাস নিহত হয়েছেন। আর তার মৃত্যু রহস্যময়। ছেলে দুটোকে নিয়ে ছুটে গেলেন দূর্গম পাহাড়ি অঞ্চল খাগড়াছড়িতে। নিহত স্বামীর মৃত দেহের উপর ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকেন লীলা। কাঁদতে কাঁদতে এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ছিন্ন খঞ্জনার মত ছট্‌ফট্ করেন প্রিয় মানুষ হারাবার বেদনায়। অবশেষে জ্ঞান ফিরে পেয়ে চিৎকার করে আবার কাঁদতে থাকেন– আমার ছেলে দুটোর কী হবে?।

স্বামীর সৎকারের পর এতিম দু শিশুকে নিয়ে বিডিআর-এর দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে বেড়ান সরকারি সাহায্যের আশায়। কিন্তু রহস্যময় মৃত্যুর কোনো কূল-কিনারা হয় না। অনন্যোপায় হয়ে শ্বশুরবাড়ি এসে উঠলেন লীলা। কিন্তু বিধি তার বাম। নিষ্ঠুর শ্বশুর আর ভাসুর তাকে তার ছেলে দুটো-সহ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এমনকি তারা মাথা গোঁজার ঠায়টুকুও দেয়নি। অবশেষে বাবার বাড়িতে এসে ওঠেন লীলা। শুরু হয় পরনির্ভরশীল অক্ষম এক জীবন। হতাশার অন্ধকারে খুঁজে ফেরেন আলোর দিশা। কিন্তু লীলা আলো কোথায় পাবেন? চারিদিকে কেবলই অন্ধকার। শুধুই অন্ধকার।

এমন এক হতাশায় মুষড়ে পড়া দিনে ২০০১ সালে স্থানীয় উজ্জীবক সত্যেন দাসের আমন্ত্রণে তিনি রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১৫৬তম ব্যাচ)। প্রশিক্ষণে এসে শোনেন জীবনের কথা, আত্মশক্তির কথা। শোনেন ঘুরে দাঁড়াবার সেই চিরন্তন বাণী– 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না।' লীলা রাণীর চিন্তা চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেয় এই প্রশিক্ষণ। সত্যিইতো, ভাগ্যের কাছে হেরে গেলে চলবে না। জীবন যুদ্ধে তাকে যে জয়ী হতে হবে। ছেলে দুটোকে মানুষ করতে হবে। সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। হতে হবে স্বাবলম্বী।

বাড়ি ফিরে লীলা শুরু করেন পাড়ায় পাড়ায় প্রাইভেট পড়ানো। শুরু করেন মাছ চাষ, মুরগি পালন ও সবজি চাষ-সহ নানা আয়মুখী কার্যক্রম। অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেন দিনের পর দিন। আর এই পরিশ্রমের ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতা ধরা দেয় তাকে। ভালো ফলাফল নিয়ে স্কুলে পড়তে থাকে তার ছেলেরা।

শুধু নিজের জীবনের কথা ভেবে বসে থাকেননি লীলা রাণী। ভাবতে থাকেন তার চারপাশে অবহেলিত হতদরিদ্র নারীদের কথা। আর সেই ভাবনা থেকেই অসহায় নারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'সুরমা গণগবেষণা সঞ্চয় সমিতি'। এখানে নারীরা সাপ্তাহিক সঞ্চয় করেন। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৮ জন নারী। সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৬৮ হাজার ১৯ টাকা। এছাড়া সমিতি থেকে সমিতির সদস্য-সহ আশপাশের মানুষদের ঋণ দেয়া হয়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৯০০ টাকা। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে ১৮ জন হতদরিদ্র নারী নানা আয়মুখী কার্যক্রম চালাচ্ছেন। স্বামী পরিত্যক্তা শিউলি বেগম শত অভাবের মাঝেও সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে মাছের চাষ করে সংসার চালাচ্ছেন। সেলাই মেশিন কিনেছেন লতিকা রাণী রায়। গ্রামের নারীদের জামা-কাপড় বানিয়ে তিনিও ভালই আয় করছেন। নমিতা রায় করছেন গাভি পালন। আর এমনিভাবে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে নাজমা বেগম, শান্তি রায়, চম্পা হালদারেরা যুক্ত হয়েছেন আয়মুখী কার্যক্রমে।

নিজেকে আরও বিকশিত করার লক্ষ্যে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৫৫তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন লীলা রাণী। চারদিনের এই প্রশিক্ষণে নিজেকে একজন নারীনেত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন তিনি। বাড়ি ফিরে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং এ লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের হয়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম শুরু করেন। ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড ও বয়স্ক ভাতা যাতে সঠিক ব্যক্তি পেতে পারেন সেজন্য তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন তিনি। ষাটগুম্বজ ইউনিয়নে নারীদের যে কয়টি সঞ্চয় সমিতি আছে তাদের একত্রিত ও সংগঠিত করে সিবিও গঠন করেন এবং তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন।

গর্ভবতী নারীদের টিকা, তাদের পুষ্টি ও চিকিৎসা নানা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন লীলা রাণী। নিয়মিত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে গর্ভবতী নারীদের নিয়ে উৎসাহ যোগান। প্রসূতী মায়ের সেবা, বাল্যবিবাহ বন্ধ ও নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে তার ভূমিকা চোখে পড়ার মত। অনেক অসহায় মানুষের আশ্রয়স্থল এখন তিনি। লীলা ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বাদোখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে

দায়িত্ব পালন করছেন।

নিজ আয়ে জমি কিনে পাকা বাড়ি বানিয়েছেন লীলা। বড় ছেলে সোহাগ দাস কৃষি বিষয়ে স্নাতক সম্মান (অনার্স) ও মাস্টার্স পাশ করে অস্ট্রেলিয়ার একটি কোম্পানিতে চাকরি করছেন। ছোট ছেলে চয়ন দাস সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। সিঙ্গাপুরে কর্মরত আছেন।

লীলা রাণী দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন। তার চিন্তা-চেতনায় যুক্ত হয়েছে যুদ্ধ জয়ের অনেক অভিজ্ঞতা। শিখেছেন কীভাবে জয়ী হতে হয়। আর তার এই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান তার চারপাশের হতদরিদ্র নারীদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, যা আশার আলো হয়ে ফুটছে অনেক দুস্থ নারীর জীবনে। তৃণমূলের নারীনেত্রী লীলা রাণী নিজে যেমন হার মানেননি ভাগ্যের কাছে, তেমনি অন্যদেরও জয়ী হতে উৎসাহিত করে চলেছেন নিরন্তর।

জীবন সংগ্রামে জয়ী রীতা রায় চৌধুরী

সাধন দাশ

বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার শুভদিয়া ইউনিয়নের তেকাটিয়া গ্রামের বাসিন্দা নারীনেত্রী রীতা রায় চৌধুরী। বর্তমানে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জননী। স্বামীর সংসারে শাশুড়ি-সহ সদস্য সংখ্যা মোট পাঁচজন। স্বামীর স্বল্প আয়ে কোনরকমে চলে সংসার। কিন্তু মেটানো যায় না সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ। এ অবস্থায় কীভাবে চলবে তার সংসার, তা ভেবে কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। তাই কীভাবে অর্থ উপার্জন করা যায়, সন্তানদের মানুষ করা যায়– এ নিয়ে নানান চিন্তা তার মাথায়।

সময় যায়, দিন যায়। রীতা বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের আমন্ত্রণ পান এবং প্রশিক্ষণটিতে (১২৫তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। চার দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তিনি বুঝতে পারেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে লুকায়িত অনেক প্রতিভা। প্রতিটি মানুষই পরিশ্রম দ্বারা তার নিজের ভাগ্য বদলাতে পারে। তিনি এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখেছেন প্রতিটি নারী ইচ্ছা করলে বাড়িতে বসেই অনেক অর্থ আয় করতে পারেন। যেমন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, গাভি পালন ও সেলাইয়ের কাজ। এর জন্য প্রয়োজন সামান্য পুঁজি বিনিয়োগ করা। তিনি ভাবতে লাগলেন কীভাবে আয়ের ক্ষেত্র তৈরি করা যায়।

শুভদিয়া ইউনিয়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে ও সহযোগিতায় এক মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী সাধন কুমার দাশের আমন্ত্রণে সেই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন রীতা রায় চৌধুরী। প্রশিক্ষণের পর বাড়িতে থাকা একটি শিরিস গাছ বিক্রি করে একটি সেলাই মেশিন কিনেন তিনি। প্রথমে ভাংগনপাড় বাজার হতে এক দর্জির কাছ থেকে শুধুমাত্র ব্লাউজ সেলাই করার অর্ডার নেন। প্রতিটি ব্লাউজ সেলাই বাবদ তিনি পারিশ্রমিক পান দশ টাকা। প্রতিদিন ৪-৫টি ব্লাউজ সেলাই করেন রীতা। এভাবে আস্তে আস্তে অন্যান্য কাপড় সেলাইয়ের কাজও শুরু করেন তিনি। দিন দিন তার আয়ও বাড়তে থাকে। সেলাইয়ের কাজ করে যে আয় হয় তা দিয়ে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ বেশ ভালভাবে মিটাতে থাকেন তিনি। এছাড়া উপার্জিত অর্থের একটি অংশ (প্রতিমাসে ৫০০ টাকা) স্থানীয় একটি সমিতিতে সঞ্চয় করেন রীতা। গত ডিসেম্বরে (২০১৫) সেই সঞ্চয়ের টাকা মুনাফা-সহ তুলে নিয়ে তিনি নিজে কিছু কাপড় কিনেন। সে কাপড় বিক্রয় করে লাভ হয়, আবার অনেকে এই কাপড়গুলো ক্রয় করে রীতাকে দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় কাপড় সেলাই করে নেন। কাপড় বিক্রি ও সেলাই করে তার প্রতিমাসে সাত হাজার টাকা আয় হয়। তার ও স্বামীর দু জনের আয়ে এখন সংসার ভালভাবেই চলছে। বর্তমানে রীতা রায় চৌধুরী নিজের আয় থেকে ১৩টি মুরগি, পাঁচটি হাঁস ও একটি ছাগলের বাচ্চা ক্রয় করেছেন।

শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত নন রীতা রায় চৌধুরী। বরং ওয়ার্ড অ্যাকশন টিমের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখছেন তিনি। টিমের প্রতিটি সভায় তিনি উপস্থিত থাকেন। নিজ গ্রাম ছাড়াও পার্শ্ববর্তী গ্রামের নারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একের পর এক উঠান বৈঠকের আয়োজন করে চলেছেন তিনি। উঠান বৈঠকে তিনি বাল্যবিবাহের কুফল, মাতৃস্বাস্থ্য ও পুষ্টি-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তার প্রচেষ্টার ফলে উপরোক্ত বিষয়গুলোতে তেকাটিয়া ও তার আশপাশে গ্রামগুলোতে গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় কন্যাশিশু দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নারীনেত্রী রীতা রায় চৌধুরী।

সফলতার কথা জানতে চাইলে রীতা জানান, 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণটি তার জীবনে নিয়ে এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। আর পরিপূর্ণ সফলতা নিয়ে এসেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত সেলাই প্রশিক্ষণ। রীতা রায় চৌধুরী জানান, তিনি নিজের জীবনে যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন, একই পরিবর্তন অন্য অসহায় নারীদের জীবনেও নিয়ে আসতে চান তিনি। সে লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছেন তৃণমূলের উদ্যমী নারীনেত্রী রীতা রায় চৌধুরী।